গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৭ বর্ষ ২৬ সংখ্যা | ৭ - ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

কুম্ভমেলার আকাশে-বাতাসে আকুল আর্তি

‘আমার মাকে কেউ ফিরিয়ে দাও’

দেশ জুড়ে জমকালো প্রচার, বিশ্বমানের ব্যবস্থাপনার আশ্বাস, আর কোটি কোটি সাধারণ মানুষের মনে ফেনিয়ে তোলা ধর্ম-জিগির— এই ত্রিবেণী সঙ্গমে কতগুলি মানুষের তাজা প্রাণ যে নিথর হয়ে গেল— কে-ই বা তা জানে! হতাহতের সংখ্যা কত তাও জানা নেই। মহাকুম্ভ মেলা আয়োজনকারী উত্তরপ্রদেশের বিজেপি সরকার চায় না সঠিক পরিসংখ্যান প্রকাশ করতে। শাহি স্নানের ব্রাহ্ম মুহূর্তে ২৯ জানুয়ারি মধ্যরাত এবং ৩০ জানুয়ারি ভোরে সঙ্গম ঘাট সংলগ্ন রাস্তায় ও ঝুসি এলাকায় দফায় দফায় পদপিষ্ট হওয়া ও মৃত্যুর ঘটনাকে স্রেফ অস্বীকার করতে চেয়েছিল তারা। সমস্ত প্রশাসন ও প্রচারযন্ত্রকে কাজে লাগিয়ে সোচ্চারে বলতে চেয়েছিল, ‘তেমন কিছুই হয়নি, ভিড়ে একটা ধাক্কাধাক্কির মতো ঘটনা ঘটেছিল, এখন সামলে নেওয়া গেছে।’ কিন্তু ঘটনা প্রবাহ এমন ভাবে এগিয়েছে যে, পুরো বিষয়টিকে ধামাচাপা দেওয়ার সব রকম চেষ্টা সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত তা কার্যকর করা গেল না। পরিস্থিতি বুঝে প্রায় একদিন পর সরকার হিসেব দিল মৃতের সংখ্যা ৩০! নিকটবর্তী মতিলাল নেহেরু হাসপাতালের মর্গের ইনচার্জকে প্রশ্ন করা হলে তাঁর ধোঁয়াশাজনক উত্তর পরিস্থিতির ভয়াবহতা সম্পর্কে আরও নিশ্চিত আভাস দেয়। তিনি বলেন, ‘আমার সরকার যখন বলেছে সংখ্যা ৩০, তখন আমি এর বাইরে যাব না। অন্য কে কী বলছে জানি না, আমি আমার সরকারের পক্ষে।’

৪৫ দিন ব্যাপী মেলায় প্রায় ৪০ কোটি মানুষ আসার প্রত্যাশা

দুয়ের পাতায় দেখুন

অল বেঙ্গল ইলেক্ট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের ১৯তম রাজ্য সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশ দক্ষিণ ২৪ পরগণার বারুইপুর রেল মাঠে। ১ ফেব্রুয়ারি

মহাকুম্ভে মর্মান্তিক মৃত্যু

সরকারি অবহেলার তীব্র নিন্দা

এস ইউ সি আই (সি)-র

বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার ও উত্তরপ্রদেশ রাজ্য সরকারের অপরাধমূলক গাফিলতির ফলে মহাকুম্ভ মেলায় পদপিষ্ট হয়ে যে নির্মম মৃত্যু ঘটেছে সে সম্পর্কে এসইউসিআই(সি) দলের সাধারণ সম্পাদক প্রভাস ঘোষ ৩০ জানুয়ারি নিম্নলিখিত বিবৃতি দেন।

সরকারি রিপোর্ট অনুযায়ী ২৯ জানুয়ারি ভোররাতে প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভ মেলায় পদপিষ্ট হওয়ার ভয়ঙ্কর ঘটনায় কমপক্ষে ৩০ জনের মৃত্যু, ৬০ জনের গুরুতর আহত হওয়া এবং বহুজনের নিখোঁজ হওয়ার খবরে দেশবাসী শোকস্তব্ধ।

চারের পাতায় দেখুন

স্মার্ট মিটার বাতিলের দাবি অ্যাবেকা সম্মেলনে

স্মার্ট মিটার বাতিল, বর্ধিত ফিক্সড চার্জ, মিনিমাম চার্জ ও এফপিপিএস প্রত্যাহার, ২০০ ইউনিট পর্যন্ত ও কৃষিতে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সহ অন্যান্য দাবিতে ১ ফেব্রুয়ারি অল বেঙ্গল ইলেক্ট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের ১৯তম রাজ্য সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হল দক্ষিণ ২৪ পরগণার বারুইপুর রেল মাঠে। উপস্থিত ছিলেন কয়েক হাজার বিদ্যুৎ গ্রাহক।

সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি অনুকূল ভদ্র। শুরুতে বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক সুব্রত বিশ্বাস। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন পরিবেশবিদ প্রদীপ দত্ত, বিদ্যুৎ বিশেষজ্ঞ অনির্বাণ গুহ, অল ইন্ডিয়া ইলেক্ট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের

আটের পাতায় দেখুন

বাজারসঙ্কট থেকে রেহাই পেতে ব্যর্থ চেষ্টা

কেন্দ্রীয় বাজেট

এ বারের কেন্দ্রীয় বাজেট নাকি জনগণের হাতে অতিরিক্ত অর্থের জোগান দেবে, যা ঝিমিয়ে পড়া অভ্যন্তরীণ বাজারকে চাঙ্গা করে তুলবে। অন্তত বিজেপি নেতা-মন্ত্রীদের তাই বয়ান। কিন্তু সত্যিই কি এই বাজেট বাজার সঙ্কট থেকে রেহাই পেতে কোনও রকম সাহায্য করবে? দেখা যাক।

কোনও একটি দেশের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি কী? মানুষের ক্রয়ক্ষমতা। দেশে ক্রয়ক্ষমতা সম্পন্ন মানুষের সংখ্যা যত বেশি হবে অর্থনীতি তত গতিশীল হবে। ভারতীয় অর্থনীতির এখন মূল সমস্যা কী? শিল্প এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে উৎপাদিত পণ্যের চাহিদার অভাব। মন্দায় আক্রান্ত বাজার। এর হাত থেকে অর্থনীতির রেহাইয়ের রাস্তা কী? মানুষের চাহিদা তথা পণ্য কেনার ক্ষমতা বাড়ানো। কী উপায়ে তা বাড়তে পারে? মানুষের হাতে পণ্য কেনার মতো ক্ষমতা জুগিয়ে। এই ক্ষমতা কী ভাবে জোগানো সম্ভব? মানুষের রোজগার বাড়িয়ে। মূল্যবৃদ্ধি রোধ করে। জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় খরচ— শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান সহ অন্যান্য খরচের সীমাকে নামিয়ে এনে। সাধারণ মানুষের ওপর চাপানো পরোক্ষ করের বোঝা কমিয়ে।

প্রধানমন্ত্রী থেকে অর্থমন্ত্রী সকলেই এ বারের কেন্দ্রীয় বাজেটকে জনগণের জন্য বাজেট বলে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। সরকার অনুগত প্রচারমাধ্যমগুলি তারস্বরে সে কথাই প্রচার করে চলেছে। বাস্তবটা কি সত্যিই তাই? দেখা যাক, বাজেটে বিজেপি সরকার সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য কী কী পদক্ষেপ নিয়েছে।

বিজেপি নেতা-মন্ত্রী এবং প্রচারমাধ্যম সবচেয়ে বেশি হইচই বাধাচ্ছে যা নিয়ে তা হল আয়করে ছাড়। সরকার যে নতুন করনীতি ঘোষণা করেছে তাতে মধ্যবিত্ত অংশের রোজগারে কর কমানো হয়েছে এবং বছরে ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বার্ষিক আয়ে কর পুরোপুরি মকুব করা হয়েছে। ২০২৩-এ ৭ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় করমুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল। এ বার তা বাড়িয়ে ১২ লক্ষ টাকা করা হল। এর ফলে অতিরিক্ত ১ কোটি মানুষকে কোনও আয়কর দিতে হবে না।

ভারতে ১৪০ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে আয়কর দেওয়ার মতো রোজগার রয়েছে কতটুকু অংশের মানুষের? মেরেকেটে ১০ কোটির আশেপাশে। এর মধ্যে মধ্যবিত্তের সংখ্যা কত? ৩.২ কোটি। বাকি প্রায় ৭ কোটি মানুষ যাঁরা আয়কর দেন, তাঁরা উচ্চবিত্ত এবং ধনী। বাজারে কেনাকাটা বাড়াতে আয়কর কমিয়ে মানুষের হাতে অতিরিক্ত অর্থের জোগান দেওয়ার দাবি অনেক দিন ধরেই করে আসছিলেন শিল্পপতিদের সংগঠনগুলি এবং অর্থনীতির বিশেষজ্ঞরা। সরকার এ বার সে দাবি মানল। কিন্তু সরকারের এই পদক্ষেপে কি মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে? মূল্যবৃদ্ধি রোধে সরকার কী ব্যবস্থা নিল? বাজেটে তেমন কোনও পরিকল্পনার কথা নেই। কর্মসংস্থান তৈরি করে মানুষের রুজি-রোজগার বাড়াতে পারলে বাজারে চাহিদা সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু

সাতের পাতায় দেখুন

‘আমার মাকে কেউ ফিরিয়ে দাও’

একের পাতার পর

এবং প্রচার ছিল সরকারের। কিন্তু কেন যথাযথ অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা ছিল না? একাধিকবার আগুন লেগে সেক্টর ১৯ ও সেক্টর ২২-এর প্রায় ২০০টি তাঁবু পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। ছিল না প্রয়োজনীয় সংখ্যায় স্বেচ্ছাসেবক ও পুলিশ-প্রশাসনের দিক থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্যের ব্যবস্থা। বিপর্যয় মোকাবিলা টিম ছিল না, ছিল না অ্যাম্বুলেন্স চলাচলের পরিসর। ভিভিআইপিদের সঙ্গম ঘাটে নির্বিঘ্নে পৌঁছে দেওয়ার পথ প্রশস্ত করতে কোটি কোটি সাধারণ মানুষের চলবার পথ হয়েছে সংকীর্ণ। সাধারণ পুণ্যার্থীদের দীর্ঘ পথ হেঁটে স্নান ঘাটে পৌঁছতে হচ্ছিল। প্রয়াগরাজ থেকে বারাণসী— আড়াই ঘণ্টার পথ পেরোতে গাড়ির সময় লাগছিল সাড়ে দশ ঘণ্টা। প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিজ্ঞতা— সর্বত্রই সম্পূর্ণ অব্যবস্থায় ভরা এই মেলা।

উত্তরপ্রদেশের বিজেপি সরকারের ‘বিশ্বমানের ব্যবস্থাপনা’ কেন ‘ব্রাহ্ম মুহূর্তে’ এমনভাবে পদপিষ্ট হল, তার পিছনে উঠে আসছে অনেক কথা। সরকারি মতে, সঙ্গম যাওয়ার পথে আখড়া মার্গের কাছে ব্যারিকেড ভেঙে ভিড় এগোতে থাকে এবং পথে শুয়ে থাকা পুণ্যার্থীদের পিষে দেয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান কিন্তু অন্যরকম। তাঁরা জানিয়েছেন, পথের পন্টুন ব্রিজগুলি আটকে পুণ্যার্থীদের এগোতে বাধা দেয় পুলিশ। লাঠিচার্জও করা হয়। ফলে আতঙ্কিত মানুষ দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছোটাছুটি শুরু করলে পদপিষ্ট হওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়। ঝুসির ঘটনাস্থলে উপস্থিত এক দোকান-কর্মী নেহা ওঝা বলেন, ‘চারদিকে মৃতদেহ পড়েছিল। ওঁরা সকালবেলা মারা গিয়েছেন, দুপুর দেড়টা নাগাদ দেহ নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কেউ ভিডিও করতে গেলে তাদের বাধা দিচ্ছিল পুলিশ’। একাধিক সংবাদসংস্থার ভিডিও ফুটেজে ধরা পড়েছে ঝুসির সেই দৃশ্য। পড়ে থাকা জামাকাপড়, জুতো ট্র্যাক্টর দিয়ে পরিষ্কার করা হচ্ছে। ঘটনার সত্যাসত্য হয়তো শেষপর্যন্ত চিরতরে হারিয়ে যাবে ওই মহাকুম্ভ মেলায় নিহত ও আহতদের হারিয়ে যাওয়া জামা জুতার মতোই।

কিন্তু শেষ সত্য হিসেবে উঠে আসছে যা, তাতে শোনা যাচ্ছে শুধুই আর্তনাদ, স্বজন হারানোর বুকফাটা কান্না— ‘আমার মাকে কেউ ফিরিয়ে দাও। মানুষটার খুব ইচ্ছে ছিল গো, একবার কুম্ভস্নান করার— এত কাছে এসেও আর হল না, সব শেষ, সব শেষ...।’ শিশুসন্তানকে কোলে আঁকড়ে পড়ে আছে মায়ের নিথর দেহ। কেউ হারিয়েছেন প্রৌঢ়া মাকে, কেউ ৩৩ বছরের তরতাজা যুবক সন্তানকে। তাদের মর্মন্তুদ হাহাকারে ভারী হয়ে উঠেছে বাতাস। যোগী সরকার বাধ্য হয়ে ৩০ জন পুণ্যার্থীর মৃত্যুর দায় স্বীকার করে ২৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করলেও একটি মৃতদেহেরও ময়নাতদন্ত পর্যন্ত করেনি, মৃত্যুর শংসাপত্রও পরিজনদের হাতে দেয়নি। অর্থাৎ কোনও ভাবেই মহাকুম্ভ মেলায় পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর কোনও লিখিত সরকারি নথি যাতে না থাকে, সে ব্যাপারে প্রশাসন অতি সতর্ক। মৃতের পরিজনদের কাউকে বলা হয়েছে— ‘বাড়ি চলে যান, হোয়াটসঅ্যাপে সব পেয়ে যাবেন’, কারও হাতে মৃতদেহ তুলে দেওয়ার বিনিময়ে টাকা চাওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ। এই দৃষ্টিভঙ্গি এবং আচরণ মানুষের, নাকি পিশাচের— ভাবনা জাগে! মানুষ সম্পর্কে, মানুষের জীবন সম্পর্কে এদের মনোভাব শুধুমাত্র লাভ-লোকসানের হিসেবে মাপা।

প্রকৃত ধর্মপ্রাণ কোনও মানুষ বা সরকারের পক্ষে কি মানুষের জীবনহানির ঘটনাকে এভাবে দেখা সম্ভব! অথচ বিজেপি নেতারা বলছেন, ‘এত বড় মেলায় ছোটখাটো ঘটনা তো ঘটতেই পারে। সবকিছু ঠিকঠাক চলছে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে’। এদের সাথে ধর্মের কি কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে! অথচ এই বিজেপি নেতাদেরই আহ্বানে, দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, বিজেপির হিন্দুত্বের পোস্টারবয় উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের দেশজোড়া প্রচারে হু হু করে মানুষ ছুটেছেন, ঝাঁপ দিয়েছেন মহাকুম্ভের অব্যবস্থার ওই অন্ধ গহ্বরে। মানুষ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করবেন কি করবেন না, কে কোন ধর্মের চর্চা করবেন, তা তাঁদের ব্যক্তিগত বিষয়। কিন্তু যে ধর্ম-ব্যবসায়ীরা মানুষের আবেগের সুযোগ নিয়ে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে প্রচার করে ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক আখের গোছাতে চায়, তাদের পুরো কারবারটাই অধার্মিক নয় কি? উত্তরপ্রদেশের বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ২০১৯ সালের হিসেব দিয়েছেন। সেবার অর্ধকুম্ভ মেলা থেকে রাজ্যের লাভ হয়েছিল ১.২ লক্ষ কোটি টাকা। অনুমান, এবার মহাকুম্ভ মেলা থেকে উত্তরপ্রদেশ সরকারের লাভ হতে চলেছে কমপক্ষে ২ লক্ষ কোটি টাকা। ফলে সাধারণ মানুষের কাছে ধর্ম গভীর বিশ্বাস ও আবেগের বিষয় হলেও মেলার আয়োজনকারীদের কাছে তা যে কেবল লাভের অঙ্ক— এ আজ প্রমাণিত সত্য। এ বছরেই দিল্লি ও বিহার দুই রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন। বেকার সমস্যা, নারী নির্যাতন, মূল্যবৃদ্ধি, শিক্ষা সংকট, স্বাস্থ্য সংকট, কৃষক আত্মহত্যা ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রে দেশ জুড়ে সাধারণ মানুষের জীবন জর্জরিত। এ অবস্থায় নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে বিজেপির প্রয়োজন ধর্মীয় আবেগের মতো একটি স্পর্শকাতর বিষয়কে বিরাট ধামাকায় পরিণত করে ভোটবাক্সে তার ফসল তোলা। তাই মহাকুম্ভ নিয়ে প্রচারের এই ঢক্কানিনাদ। তাই-ই হেলিকপ্টার থেকে পুষ্পবৃষ্টির আয়োজন করে চমক তৈরি করা। এ সবেরই বলি হতে হল এতগুলি মানুষকে।

গত অক্টোবর মাসে উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলির নেতারা রীতিমতো ঘোষণা করেছিলেন যে, অ-সনাতনী বা সনাতন হিন্দু ধর্মে অবিশ্বাসীদের মহাকুম্ভ মেলায় প্রবেশ নিষেধ। এমনকি অ-হিন্দুরা মেলায় দোকান পর্যন্ত খুলতে পারবেন না। অথচ সেদিন পদপিষ্ট হওয়া, ভিড়ে ঠেলাঠেলিতে অসুস্থ হয়ে পড়া, আতঙ্কগ্রস্ত হিন্দু পুণ্যার্থীরা বিপদে তাঁদের পাশে পেয়েছিলেন অন্য ধর্মের বহু মানুষকেও। মেলা প্রাঙ্গণের বাইরের মহল্লায় দোকান খুলিয়ে পুণ্যার্থীদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন আনোয়ার শপিং কমপ্লেক্সের নিকটবর্তী বাসিন্দা মোহাম্মদ আনাস। ওই শপিং কমপ্লেক্সের অধিকাংশ দোকানদার ধর্ম-পরিচয়ে মুসলমান। কিন্তু ২৯ ও ৩০ জানুয়ারি রাতে সেখানে আশ্রয় পেয়েছিলেন দেড় হাজারের মতো হিন্দু পুণ্যার্থী (সূত্র ঃ দ্য হিন্দু, ১ ফেব্রুয়ারি, ’২৫)।

এক মসজিদের ইমাম সাহেব ক্লান্ত ক্ষুধার্ত পুণ্যার্থীদের আশ্রয় ও খাদ্যের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। এটাই তো বহু ভাষা-জাতি-ধর্মের বৈচিত্রে গড়া ভারতবর্ষের স্বাভাবিক আচরণ ও সংস্কৃতি! এই সংস্কৃতিকে যারা ভেঙে টুকরো টুকরো করতে চায়, সেই ধর্মব্যবসায়ীদের জাতির জীবন থেকে সরিয়ে দেওয়ার আহ্বান সেই ১৯৪০ সালেই জানিয়েছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। সেই আহ্বানের মূল্য কি এখনও মানুষ দেবে না!

কমরেড কার্তিক সাহার জীবনাবসান

এসইউসিআই(সি) দলের রাজ্য কমিটির প্রবীণ সদস্য, শিক্ষা ও শিক্ষক আন্দোলনের নেতা ও সংগঠক কমরেড কার্তিক সাহা ৩১ জানুয়ারি মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত কারণে ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ১ ফেব্রুয়ারি রাজ্য অফিসে তাঁর মরদেহ নিয়ে আসা হয়।

সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। তাঁর প্রথম কর্মক্ষেত্র উল্টোডাঙায় মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে নিমতলা ঘাট শ্মশানে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

জীবনাবসান

উত্তর ২৪ পরগণায় বারাসাত-বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার হাবড়া লোকাল কমিটির আবেদনকারী সদস্য কমরেড পরিমল হালদার ব্রেন টিউমারে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘ রোগভোগের পর ৬ জানুয়ারি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর। তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড গোপাল বিশ্বাস, জেলা সম্পাদক কমরেড তুষার ঘোষ ও দলের কর্মী-সমর্থক সহ বহু মানুষ তাঁর বাড়িতে যান এবং মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান।

এলাকায় জনপ্রিয় মানবদরদি চিকিৎসক হিসেবে বহু মানুষের ভরসার জায়গা ছিলেন তিনি। গভীর সত্যনিষ্ঠা, উন্নত সংস্কৃতি ও বিশ্লেষণী মনের অধিকারী এই মানুষটি দীর্ঘদিন ধরে বামপন্থী পরিমণ্ডলে ছিলেন। জীবনের শেষ দিকে তিনি মার্ক্সবাদী দার্শনিক কমরেড শিবদাস ঘোষের আদর্শের সন্ধান পান। ভারতে বামপন্থী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত মানুষটি শিবদাস ঘোষের চিন্তার মধ্যে নতুন করে দিশা খুঁজে পান এসইউসিআই(সি)-র সঙ্গে সক্রিয় ভাবে যুক্ত হওয়ার পর থেকে।

কর্মজীবনের শুরু থেকেই দরিদ্র, অসহায় মানুষের পাশে থাকতেন তিনি। এই দলের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর জীবন সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যায়। শোষিত নিপীড়িত মানুষের মধ্যেই আছে সমাজ পরিবর্তনের মূল চালিকাশক্তি— এ কথা তিনি উপলব্ধি করেন। বৃহত্তর হাবড়ার বিড়ি শ্রমিক, নির্মাণ শ্রমিক অধ্যুষিত বহু এলাকায় ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প পরিচালনা করেন তিনি। এলাকায় নভেম্বর বিপ্লব শতবার্ষিকী উদযাপন কমিটি, বিদ্যাসাগর জন্মদ্বিশতবর্ষ উদযাপন কমিটি, লেনিন প্রয়াণ শতবার্ষিকী উদযাপন কমিটি প্রভৃতি সংগঠনে বৃহত্তর অংশের মানুষকে যুক্ত করে সমাজ পরিবর্তনের পরিপূরক রাজনৈতিক-সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও সভাপতি হিসেবে তিনি নেতৃত্বকারী ভূমিকা পালন করেন।

২৮ জানুয়ারি তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয় হাবড়া স্টেশন চত্বরে। সভায় উপস্থিত ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড শঙ্কর ঘোষ। তিনি প্রয়াত কমরেডের সংগ্রামী জীবনের বহু দিক তুলে ধরেন। পার্টিকর্মীরা ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা ছাড়াও এলাকার বহু মানুষ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। বহু মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসে তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান।

তাঁর মৃত্যুতে দল হারাল বিপ্লবী বামপন্থার একজন গুরুত্বপূর্ণ অভিভাবককে, জনসাধারণ হারাল একজন দরদি চিকিৎসক ও গণসংগ্রামের একজন গুরুত্বপূর্ণ পৃষ্ঠপোষককে।

কমরেড পরিমল হালদার লাল সেলাম

জাতি ধর্ম সম্প্রদায়ের নামে খেপিয়ে তুলে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষকে একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারলে লাভ কার? জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে শোষণের স্টিম-রোলার চালায় যারা, সেই পুঁজিপতি শ্রেণির শোষণে জর্জরিত বিচ্ছিন্ন মানুষ অসহায়। কিন্তু তারাই যদি ঐক্যবদ্ধ হয়, তাহলে সেই শক্তির মোকাবিলা করা দুঃসাধ্য। ঐক্যের এই শক্তিকেই ভয় পায় মুনাফালোভী পুঁজিপতি শ্রেণি আর তাদের সেবাদাস ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক দলগুলি। এরাই সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে কলুষিত করতে চায় দেশের আকাশ বাতাস। কেন্দ্রে ও বিভিন্ন রাজ্যে শাসন ক্ষমতায় থেকে বিজেপি মালিক শ্রেণির দেওয়া এই দায়িত্ব পরম নিষ্ঠায় পালন করে চলেছে। ধর্ম তার কাছে শুধুমাত্র একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। প্রকৃত ধর্ম সাধনার সঙ্গে বিজেপির যে সত্যিকার কোনও সম্পর্ক নেই, মহাকুম্ভ মেলার আয়োজন এবং বিপর্যয়-পরবর্তী সরকারি ভূমিকা তা আবারও দিনের আলোর মতো স্পষ্ট করে দিল।

জনগণের স্বার্থে নয়, মনমোহন সিংহ যা করেছিলেন তা ভারতীয় পুঁজিবাদের স্বার্থেই

কিছুদিন আগে প্রয়াত হয়েছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ। তাঁর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে সংবাদমাধ্যমে এখনও ভাবোচ্ছ্বাসের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। বলা হচ্ছে, তিনি নাকি ছিলেন 'স্বপ্নদ্রষ্টা', 'ভারতীয় অর্থনীতির নতুন পথের দিশারি', 'তাঁরই প্রবর্তিত নয়া শিল্পনীতি, অর্থনীতির পথ অনুসরণ করে ভারত আজ বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশে পরিণত হয়েছে', ইত্যাদি।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, অর্থনীতিতে পাণ্ডিত্যের প্রশ্নে মনমোহন সিংহ ভারতের অর্থনীতিবিদদের মধ্যে অন্যতম। কংগ্রেস, বিজেপি সহ নানা দলের বর্তমান সাংসদদের সাথে তাঁর তুলনা করলে ভদ্রতা, সৌজন্য ইত্যাদির প্রশ্নে তাঁকে এগিয়ে রাখতেই হবে। কিন্তু অর্থমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর মূল্যায়ন করতে গেলে ঠিক করতে হবে কোন দৃষ্টিভঙ্গি তে তাঁকে দেখব। দেশের শাসক শ্রেণির দৃষ্টিতে দেখলে তা এক রকম হবে। আবার শ্রমিক-কৃষক-নিম্নবিত্ত সহ সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের দৃষ্টিতে দেখলে সে মূল্যায়নের মাপকাঠি অন্য রকম হতে বাধ্য।

মনমোহন সিংহ সম্বন্ধে যে প্রশংসা শোনা যাচ্ছে, তার মূল কথা হচ্ছে তিনি ১৯৯০-এর দশকে ভারতের বাজারে দেশিবিদেশি পুঁজিপতিদের লগ্নির উপযোগী আর্থিক নীতি তৈরি করেছিলেন। আইএমএফ এবং বিশ্বব্যাঙ্কের কর্তাদের পরামর্শ অনুসারে ভারতের বাজারকে এমনভাবে সাজানোর কাজ হাতে নিয়েছিলেন, যাতে এ দেশের একচেটিয়া পুঁজিমালিকদের সাথে অন্য দেশের সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির বোঝাপড়াটা মসৃণ হয়। তার জন্য যতটা দরকার ততটা দেশের বাজার খুলে দেওয়ার কাজটা মনমোহন সিংহ দক্ষতার সাথেই করেছিলেন। ফলে ভারতের একচেটিয়া পুঁজিপতিরাও তাদের জমে থাকা অলস পুঁজিকে বিশ্বের বাজারে খাটানোর সুযোগ পেয়েছিলেন।

১৯৯১-এ কংগ্রেস সরকারের অর্থমন্ত্রী হিসেবে মনমোহন সিংহ যে আর্থিক নীতির প্রস্তাব আনেন, তার মূল কথা ছিল বেসরকারিকরণ, উদারিকরণ, সরকারি ভরতুকি হ্রাস, শিল্প মালিকদের চাহিদা অনুযায়ী শিল্প ও শ্রম আইনের ব্যাপক পরিবর্তন। জনসাধারণের ট্যাক্সের টাকায় গড়ে ওঠা বিশাল বিশাল ভারি শিল্প ও পরিষেবা ক্ষেত্রগুলোকে অলাভজনক আখ্যা দিয়ে পুঁজিপতিদের কাছে জলের দামে বিক্রি করে দেওয়া শুরু হল। উদারিকরণের নামে ব্যাঙ্ক, বিমা, বিমান পরিবহণ থেকে শুরু করে শিক্ষা স্বাস্থ্য সহ সমস্ত রকম সরকারি বিভাগ ও রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রকে দেশি বিদেশি পুঁজির বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়ার তখনই শুরু। এই নীতিতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সড়ক ও রেল পরিকাঠামো, পরিবহণে সরকারি ব্যয়বরাদ্দ কমে বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়তে শুরু করল। পাশাপাশি গড়ে উঠতে শুরু হল প্রাইভেট স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং ব্যয়বহুল হাসপাতাল ব্যবসা। রেলের মালপরিবহণ, ক্যাটারিং সহ অন্যান্য নানা বিভাগ তুলে দেওয়া শুরু হল বেসরকারি হাতে। নিয়ে আসা হল তথাকথিত 'শিল্পবান্ধব' শ্রমনীতি। তাতে জলাঞ্জলি দেওয়া হল শ্রমিক স্বার্থ। চুক্তির ভিত্তিতে অস্থায়ী ভিত্তিতে শ্রমিক কর্মচারী নিয়োগের অবাধ অধিকার দেওয়ার ছাড়পত্র দেওয়া হল মালিকদের। তারা যে কোনও সময় যে কোনও কর্মচারীকে বরখাস্ত করতে পারবে এবং ইচ্ছেমতো লক আউট, লে অফ, বেতন হ্রাস করতে পারবে। শ্রমিক কর্মচারীর সংখ্যা ইচ্ছেমতো কমিয়ে বাকিদের ওপর যত খুশি কাজের বোঝা বাড়াতে পারবে। বলা হল, নতুন যুগের শ্রমিক ইউনিয়নগুলিকেও হতে হবে 'দায়িত্বশীল' অর্থাৎ মালিকের সমস্ত অন্যায় তাদের মেনে নিতে হবে, আন্দোলন করা চলবে না। এই মনমোহিনী নীতি শুধু বেসরকারি শিল্পক্ষেত্রে নয়, সরকার তার নিজস্ব সমস্ত কর্মক্ষেত্রেও চালু করতে শুরু করল।

ভুলে গেলে চলবে না যে, মনমোহন সিং-এর প্রধানমন্ত্রিত্বে চলা দ্বিতীয় ইউপিএ সরকারের বিরুদ্ধে টুজি স্পেকট্রাম, কমনওয়েলথ, কয়লা খনি কেলেঙ্কারির অভিযোগ উঠেছে। এই সরকারের অপশাসন ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে কাজে লাগিয়েই বিজেপি ক্ষমতা দখল করেছে।

এই শিল্পনীতি ও অর্থনীতি চালু করার সময় মনমোহন সিংহ এবং তাঁর গুণমুগ্ধরা যুক্তি দিয়েছিলেন রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রগুলো সব লোকসানে চলে। চাকরির নিরাপত্তা থাকার জন্য এই সব ক্ষেত্রের কর্মচারীরা কাজ করতে চান না, ফাঁকি দেন। প্রাইভেট হয়ে গেলে মালিকের চাপে সবাই কাজ করতে বাধ্য হবে। তাঁরা আরও বললেন, একই শিল্পে অনেক দেশি-বিদেশি ব্যবসায়ী বিনিয়োগ করলে প্রতিযোগিতার ফলে পণ্য ও পরিষেবার দাম কমবে এবং মানও বাড়বে। কিন্তু উদারিকরণ বা বিশ্বায়নের ফলে সারা বিশ্বেই ঘটেছে এর ঠিক বিপরীত ঘটনা। এ দেশে টেলিকম ক্ষেত্রে তার জ্বলজ্যান্ত উদাহরণ মানুষ নিজের চোখে দেখেছে। টেলিকম ক্ষেত্র বেসরকারিকরণের সময় বেশ কিছু বেসরকারি টেলিকম কোম্পানি গজিয়ে উঠেছিল। এই সময় আম্বানি গোষ্ঠীর জিও সস্তার টোপ দিয়ে প্রায় সব প্রতিযোগীকে বাজার থেকে হটিয়ে দিয়ে প্রায় একচেটিয়া হয়ে ওঠে। সব কোম্পানি পিছিয়ে যাওয়ার পর এখন তারা ইচ্ছেমতো দাম বাড়িয়ে সাধারণ মানুষকে কার্যত বাধ্য করছে সাধ্যের বাইরে গিয়েও তাদের মুনাফা জোগাতে।

এটাই আসলে হওয়ার কথা ছিল। আজকের একচেটিয়া পুঁজিবাদের যুগে অবাধ প্রতিযোগিতার কোনও স্থান নেই। একচেটিয়া পুঁজির দাপটে ছোট পুঁজি আজ কোণঠাসা। প্রতিযোগিতা যতটুকু হয়, তাও হয় একচেটিয়াদের মধ্যেই। তাতে মানুষের কোনও সুরাহা হয় না। একচেটিয়া মালিকরা নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়ার ভিত্তিতে দাম বাড়ায়। মানুষের সামনে পছন্দের কোনও সুযোগ থাকে না। উদারিকরণ, বিশ্বায়নের ধাঁচে শ্রমনীতির কল্যাণে বর্তমানে কারখানায়, পরিষেবা ক্ষেত্রে এমনকি স্কুল-কলেজে যতটুকু কর্মসংস্থান হচ্ছে তার সিংহভাগই অস্থায়ী এবং চুক্তিভিত্তিক এবং নিতান্তই স্বল্প বেতনে। কাজের বিপুল বোঝায় শ্রমিক কর্মচারীরা অনেকেই কমবয়সেই শারীরিক এমনকি মানসিক ভাবেও অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। কিন্তু কাজ চলে যাওয়ার ভয়ে উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে, সমস্ত অন্যায় মানতে তাঁরা বাধ্য হচ্ছেন। কৃষিক্ষেত্রে সার, বীজ প্রভৃতির ওপর সরকারি ভর্তুকি ছাঁটাই করার ফলে এবং কৃষকের ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য না থাকায় চাষ এখন আর ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকদের কাছে লাভজনক নয়। ঋণ শোধ করতে না পেরে কৃষকদের আত্মহত্যা এখন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পর্যবসিত। পেটের দায়ে গ্রামীণ মানুষ স্বল্পবেতনে চুক্তিভিত্তিক মজুর খাটার জন্য সমাজ-পরিবার ছেড়ে দূরদূরান্তে পাড়ি দিতে বাধ্য হচ্ছেন লক্ষ লক্ষ গ্রামীণ মানুষ। সৃষ্টি হয়েছে 'পরিযায়ী শ্রমিক', 'গিগ শ্রমিক' প্রভৃতি। এ দিকে খাদ্যদ্রব্য সহ সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম প্রতিনিয়ত এমন লাফিয়ে বাড়ছে যে, কেনাকাটা কমাতে নিম্নবিত্ত থেকে মধ্যবিত্ত সকলেই বাধ্য হচ্ছেন। এ দেশের মধ্যবিত্তের একটা বড় অংশ পরিণত হচ্ছে নিম্নবিত্তে এবং নিম্নবিত্তরা দ্রুত পরিণত হচ্ছে দিনমজুরে, অন্নহীন, বস্ত্রহীন, বাসস্থানহীন পথের ভিখারিতে। এইরকম ভয়ঙ্কর শোষণের ফলেই এ দেশের পুঁজিপতিরা আজ হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক হয়েছে। এটাকেই পুঁজিপতিদের বেতনভুক তাত্ত্বিক ও সাংবাদিকরা গোটা দেশের অর্থনীতির বিকাশ বলে তারস্বরে প্রচার করে যাচ্ছে।

বর্তমানে কেন্দ্রের শাসক বিজেপি এবং বিরোধী কংগ্রেস ভোটের রাজনীতিতে একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও, মোদি সরকার প্রবল গতিতে মনমোহন সিং-এর এই নয়া শিল্প নীতিকেই আরও তীব্র গতিতে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। এ বিষয়ে তাদের কোনও বিরোধ নেই। দুঃখের বিষয় বামপন্থী নামধারী যে দলগুলি নানা সময় সরকারি গদির স্বাদ পেয়েছে তারা মুখে এই নয়া শিল্প অর্থনীতির বিরোধী হলেও দেশব্যাপী দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তোলার ব্যাপারে তাদের কোনও আগ্রহ নেই। যেখানে তারা সরকারে গেছে সেখানেই উদারিকরণ, বিশ্বায়নের নীতিকে কার্যকরী করার দায়িত্ব নিয়েছে। একই পথে চলেছে তৃণমূল পরিচালিত রাজ্য সরকারও। একচেটিয়া মালিকদের সোবদাসরা সকলেই এই রাস্তার পথিক। তাদের পথপ্রদর্শক মনমোহন সিংয়ের সম্বন্ধে বিভিন্ন পুঁজিবাদী দল, সরকার, বুর্জোয়া চিন্তাবিদ, সাংবাদিক সে জন্যই এত প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের বলি নিরুপায় ভারতীয় যুবকরা

এ খবর আগেই প্রকাশ্যে এসেছিল, ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়ার ভাড়াটে সেনা হিসাবে নিয়োগ করা হচ্ছে ভারতীয় যুবকদের। এবার খবর এল, সেই যুদ্ধে ভারতের ১২ জন তরুণের মৃত্যু হয়েছে এবং ১৬ জনের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। এ খবর সামনে আসার পর কেন্দ্রীয় সরকারের বিদেশমন্ত্রক নিয়মমাফিক জানিয়েছে, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে আটকে পড়া ভারতীয় তরুণদের দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে তারা রাশিয়ার সরকারি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে (এনডিটিভি ওয়ার্ল্ড, ১৭ জানুয়ারি, '২৫)। কিন্তু এটুকুতেই কি তাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যেতে পারে? নিজের দেশ ও পরিজনদের থেকে বহু দূরে অন্য একটি দেশের বাধানো যুদ্ধে প্রাণ হারানোর মতো মর্মান্তিক ঘটনা বহু প্রশ্ন তুলে দিয়ে যায়।

এই যুবকদের কাজ দেওয়ার নামে রাশিয়ায় পাঠিয়েছিল একটি বেসরকারি নিয়োগ সংস্থা। সেখানে পৌঁছানোর পর কাজ দেওয়ার বদলে তাদের ইউক্রেনের যুদ্ধে পাঠানো হয়। প্রশ্ন হল, এই ধরনের অনৈতিক ও বেআইনি কাজে লিপ্ত নিয়োগ সংস্থা এ দেশে কাজ চালিয়ে যেতে পারছে কী করে! গত বছরের শুরুর দিকেই সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল যে কাজ দেওয়ার নামে বেশ কিছু এজেন্ট ও কোম্পানি ভারতের যুবকদের রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে পাঠাচ্ছে। জানা সত্ত্বেও সেইসব এজেন্ট ও কোম্পানিগুলিকে ভারত সরকার নিষিদ্ধ করেনি কেন? এতদিনেও যুদ্ধে ভাড়া খাটানোর জন্য রাশিয়ায় পাচার হয়ে যাওয়া ভারতীয় যুবকদের ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা কেন করেনি তারা? কেনই বা ভারতীয় তরুণদের যুদ্ধে নিয়োগ বন্ধ করতে রুশ সরকারকে বাধ্য করেনি কেন্দ্রের বিজেপি সরকার? দীর্ঘ দু'বছর ধরে চলা রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে বিপুল সংখ্যক সেনা দরকার। রুশ সরকারের সেই প্রয়োজন মেটাতেই কি তার সঙ্গে যোগসাজশ করে এ ভাবে সেনা জোগান দিয়ে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার? তাই যদি হয়, তা হলে এই চরম দুঃখজনক মৃত্যুগুলির দায় তো তারা এড়াতে পারে না! নাকি ভয়ঙ্কর বেকার সমস্যার মুখে পড়ে সব জেনেশুনেই তারা এই চরম অনৈতিক মানুষ পাচার অবাধে চলতে দিয়েছে?

বুঝতে অসুবিধা হয় না, চরম বেকার সমস্যায় বিপর্যস্ত তরুণরা দেশের ভিতরে কাজ না পেয়ে নিতান্ত বাধ্য হয়েই এইসব এজেন্ট ও কোম্পানিগুলির কাছে নাম লিখিয়েছিল। এই তরুণদের দুর্দশার সুযোগ নিয়েই এরা রুশ কর্তৃপক্ষের কাছে এদের ভাড়াটে সেনা হিসাবে নিযুক্ত হওয়ার জন্য পাঠিয়েছিল। প্রশ্ন হল, এই তরুণরা বিদেশি— এ কথা জেনেও রাশিয়া এদের যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি দিল কেন? নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে যে যুদ্ধ তারা ইউক্রেনের উপর চাপিয়েছে, অন্য একটি দেশের বেকার যুবক, যে দেশ ও তার নাগরিকদের সঙ্গে সেই স্বার্থের কোনও রকম সম্পর্কই নেই, তাদের সেই যুদ্ধের বলি হতে পাঠানোর কোনও নৈতিক অধিকার কি রাশিয়ার থাকতে পারে? এ তো স্পষ্টতই ভারতের সার্বভৌমত্বকে লংঘন করা!

সাম্রাজ্যবাদের এই যুগে পৌঁছে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ও তার ধারক-বাহক সরকারগুলির কাছে বাস্তবে সামান্যতম নীতি-নৈতিকতাও আর আশা করা যায় না। সাধারণ মানুষের প্রাণের দাম— সে মানুষ নিজের দেশের নাগরিক হোক বা অন্য দেশের— তার কাছে কানাকড়িও নয়। তাই হন্যে হয়ে কাজ খোঁজা বেকার যুবকদের অন্য দেশের যুদ্ধে কামান-বন্দুকের মুখে ঠেলে দিতে বাধে না কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের। আবার রাশিয়ার সরকারও দ্বিধা করে না নিজের স্বার্থে লাগানো যুদ্ধে অন্য দেশের তরুণদের প্রাণ বলি দিতে। যতদিন পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ টিকে থাকবে, ততদিন এই বর্বরতার অবসান নেই।

সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা
ধ্বংসের বাজেট

কেন্দ্রীয় বাজেটে সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থা উন্নয়নের কোনও দিশা নেই। ১ফেব্রুয়ারি মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ ভবানীশঙ্কর দাস এক বিবৃতিতে বলেন, বাজেটে ক্যান্সারের ওষুধের ওপর আমদানি শুল্ক ছাড় এবং আগামী পাঁচ বছরে এমবিবিএস-এ ৭৫ হাজার আসন বাড়ানোর ঘোষণা আপাত ভাবে জনমুখী পদক্ষেপ বলে মনে হলেও এই বাজেট স্বাস্থ্যব্যবস্থার মূল সমস্যায় দৃষ্টিপাত করতেই ব্যর্থ হয়েছে। সরকারি স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়নে কোনও বরাদ্দ করা হয়নি। রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা, সাধারণ মানুষের সাধ্যের মধ্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা ইত্যাদি কোনও বিষয় এই বাজেটে নেই। পরিবেশ দূষণ, খাদ্যদ্রব্যের অনুন্নত মান এবং নানা যন্ত্রপাতি থেকে আসা বিকিরণ ইত্যাদি যেগুলি ক্যান্সারের কারণ হিসেবে আজ প্রধান ভূমিকা পালন করছে তা নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি এই বাজেটে অবহেলা করা হয়েছে।

ফার্মাসিউটিক্যাল নীতি সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্পোরেট প্রীতি স্পষ্ট। বিদেশি কোম্পানিগুলির ক্যান্সারের ওষুধের ওপর শুল্ক ছাঁটাই করা হলেও এ দেশের দৈত্যাকার ওষুধ কোম্পানিগুলির ওষুধের দাম মানুষের নাগালের মধ্যে রাখার কোনও ব্যবস্থা হয়নি। রাষ্ট্রায়ত্ত ওষুধ কোম্পানিগুলি একের পর এক বন্ধ করা হচ্ছে। ফলে ওষুধের বাজারে বেসরকারি কোম্পানিগুলির প্রাধান্য বেড়ে চলেছে। এরই ফল ওষুধের আকাশছোঁয়া দাম এবং মাঝে মাঝেই নানা ওষুধের আকাল। সাম্প্রতিককালে সারা দেশে টিবির ওষুধের যে অভাব দেখা দিয়েছে তা সরকারের চরম অবহেলার নিদর্শন। এর ফলে যে ক্ষতি হয়েছে তার মূল্যায়ন আজও হয়নি। একই সাথে দেখা যাচ্ছে, সরকারি হাসপাতালে নিম্নমানের স্যালাইন এবং অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের অভাবে রোগীদের মৃত্যু পর্যন্ত হচ্ছে। জনগণকে উচ্চমানের স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার বদলে সরকার ক্রমাগত তাদের বেসরকারি হাসপাতালের ব্যয়বহুল চিকিৎসার ওপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য করছে। ফলে বহু পরিবার আর্থিকভাবে নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে। মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার সরকারের এই নীতির প্রতিবাদ বারবার করেছে এবং স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সরকারের দায়বদ্ধতা ও শক্তিশালী সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার দাবি করে আসছে।

তিনি বলেন, এমবিবিএস স্তরে আসন বাড়ানোর বাড়ানোর কথা বললেও বাজেটে দেখা যাচ্ছে, সরকার বেসরকারি মেডিকেল কলেজের দিকেই ঝুঁকছে। নতুন মেডিকেল কলেজের পরিকাঠামো সংক্রান্ত গাইডলাইনে ক্রমাগত ছাড় দেওয়া হচ্ছে। ন্যাশনাল মেডিকেল কাউন্সিল এবং নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি কর্পোরেট-বান্ধব নীতি তৈরি করছে। মেডিকেল শিক্ষায় প্রাইভেট কোচিং ইনস্টিটিউটের প্রভাব ক্রমাগত বাড়ছে। সরকারি মেডিকেল এবং ডেন্টাল কলেজে নিয়োগ কার্যত বন্ধ। পরীক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন করে ক্লিনিক্যাল ট্রেনিংয়ের পরিবর্তে মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন ভিত্তিক পরীক্ষা নিয়েই ডাক্তারি সার্টিফিকেট দেওয়া হচ্ছে। এই ধরনের নিম্নমানের ডাক্তার দিয়েই প্রাইভেট হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসা ব্যবসা চলছে। মেডিকেল শিক্ষার যথাযথ উন্নতির বদলে সরকার কর্পোরেট চিকিৎসা ব্যবসায়ীদের মুনাফার জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসা-কর্মী তৈরিতেই মন দিয়েছে।

এই বাজেট জনস্বাস্থ্যের প্রয়োজনকে নস্যাৎ করে দিয়েছে। জনগণের চিকিৎসা পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করার বদলে কর্পোরেটদের মুনাফার দিকেই মূল নজর রাখা হয়েছে। জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ভেঙে দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। সরকার ওষুধের দাম নিয়ন্ত্রণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। মেডিকেল শিক্ষাকে সম্পূর্ণ ব্যবসা ভিত্তিক করে তোলা হচ্ছে। এর মাধ্যমে সরকার লক্ষ লক্ষ মানুষকে সম্পূর্ণভাবে বিশালাকায় কর্পোরেট হাসপাতাল, ওষুধ এবং ইনসিওরেন্স কোম্পানিদের গ্রাসে ঠেলে দিচ্ছে।

মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার বাজেটকে কর্পোরেটমুখী আখ্যা দিয়ে তীব্র নিন্দা করেছে এবং পরিকল্পিতভাবে সরকারি জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে দুর্বল করার চক্রান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে সর্বস্তরের মানুষের কাছে আবেদন জানিয়েছে।

সরকারি অবহেলার তীব্র নিন্দা

একের পাতার পর

সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ, অসহায় তীর্থযাত্রীরা সাহায্য চেয়ে আর্তনাদ করেছেন কিন্তু কাউকে পাননি। এটাও উল্লেখযোগ্য যে, কয়েক দিন আগেই বিধ্বংসী আগুনে মেলা প্রাঙ্গণে বেশ কিছু তাঁবু পুড়ে গিয়ে বহু মানুষ আহত হন।

কিন্তু ঘটনার থেকেও বেশি ভয়াবহ উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর আচরণ। তিনি অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে এই নির্মম মৃত্যুর ঘটনাকে লঘু করে দেখানোকেই সুবিধাজনক মনে করেছেন এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এই ঘটনা বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের অপরাধমূলক অবহেলা ছাড়া কিছু নয়। নিজেদের সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ফায়দা তুলতেই তাঁরা এত বৃহৎ অনিয়ন্ত্রিত এক ধর্মীয় জমায়েতের ব্যবস্থা করেছেন এবং এই কূট উদ্দেশ্যকে আড়াল করতেই তাঁরা মহাকুম্ভ স্নানের দ্বারা ভক্তির মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে উৎসাহ দিয়েছেন। আমরা সুনির্দিষ্ট ভাবে বলতে চাই, এতগুলি নিরীহ মানুষের প্রাণহানির নিরিখে কোনও ক্ষতিপূরণই যথেষ্ট হতে পারে না। আমরা এই নির্মম দুঃখজনক ঘটনার উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিচারবিভাগীয় তদন্ত এবং দায়ী সকলের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।

এআইকেকেএমএস-এর সম্মেলন গুজরাটে

গুজরাটের আমরেলি জেলায় গত ১৩ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হল এআইকেকেএমএস-এর সম্মেলন। প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি সত্যবান। সভাপতিত্ব করেন কানুভাই খাদাদিয়া। জেলার গ্রামগুলি থেকে শতাধিক কৃষক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। এসেছিলেন পঞ্চায়েত প্রধানরাও।

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণের দাবি

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান মনিটরিং কমিটিতে 'ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটি'র একজন প্রতিনিধি এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলার আধিকারিকদের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছিল রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটি। সেই দাবি মেনে অবশেষে মনিটরিং কমিটিতে তমলুকের এসডিওকে নেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন সেচমন্ত্রী।

সংগ্রাম কমিটির দাবি, অবিলম্বে ওই মনিটরিং কমিটিতে তাদের অন্তত একজন প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক ব্লক ও পাঁশকুড়া পৌরসভাকেও ওই প্ল্যান এলাকার অন্তর্ভুক্ত করার কথাও ঘোষণা করেছেন সেচমন্ত্রী।

সিউড়িতে প্রতিবাদ সভা

২১ জানুয়ারি সিউড়ির হাটজন বাজারে ১১ বছরের নাবালিকাকে চকলেট খাওয়ানোর নাম করে একজন কীর্তনীয়া তার সঙ্গে অশালীন ব্যবহার করে এবং তাকে ধর্ষণ করে। ধর্ষণকারীর উপযুক্ত শাস্তির দাবিতে এআইএমএসএস-এর বীরভূম জেলা কমিটির পক্ষ থেকে সিউড়ি বাসস্ট্যান্ডে ২৩ জানুয়ারি সভা হয়। বক্তব্য রাখেন এআইএমএসএসের বীরভূম জেলা ইনচার্জ কমরেড যূথিকা ধীবর এবং অন্যান্যরা। রাজ্যে দিনের পর দিন নারী নির্যাতন যেভাবে বেড়ে চলেছে তার তীব্র প্রতিবাদ করেন তাঁরা।

বইমেলায় মুক্তমঞ্চ তুলে দেওয়ার প্রতিবাদ

এ বছর কলকাতা বইমেলায় মুক্তমঞ্চ তুলে দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ড, মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস তার তীব্র প্রতিবাদ করেছে। সংগঠনের পক্ষে সম্পাদক রাজকুমার বসাক বলেন, এই সিদ্ধান্ত মুক্তচিন্তার পরিসরকে সংকুচিত করবে।

হরিয়ানায় নির্মাণ শ্রমিকদের বিক্ষোভ

এআইইউটিইউসি অনুমোদিত 'ভবন নির্মাণ কারিগর মজদুর ইউনিয়ন, হরিয়ানা'-র ডাকে ভিওয়ানিতে ১৭ জানুয়ারি বিক্ষোভ দেখালেন অসংগঠিত নির্মাণ শ্রমিকরা। সহজে নাম নথিভুক্তকরণের ব্যবস্থা চালু, মাসে ১০ হাজার টাকা অবসরভাতা, কর্মরত অবস্থায় মৃত্যু হলে ১০ লক্ষ, আহত হয়ে বিকলাঙ্গ হয়ে গেলে পাঁচ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রভৃতি নানা দাবিতে বিপুল সংখ্যক নির্মাণ শ্রমিক শহরের নেহেরু পার্কে বিক্ষোভ সমাবেশে শামিল হন।

সভাপতিত্ব করেন শ্রমিক নেতা উজির সিংহ দুলহেড়ি। সভা পরিচালনা করেন সন্দীপ মেহরা। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা নেতা ধর্মবীর সিংহ, শ্রমিক নেতা রাজকুমার বাসিয়া। উপস্থিত ছিলেন এসইউসিআই(সি)-র জেলা সচিব কমরেড রোহতাস সিংহ। বিক্ষোভ সভার পর হরিয়ানা রাজ্য সরকারের শ্রমমন্ত্রীর উদ্দেশে জেলাশাসকের কাছে দাবিপত্র পেশ করেন শ্রমিকরা।

ক্ষতিপূরণ বিলিতে অনিয়মের প্রতিবাদ

পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় গত বর্ষায় বন্যাবিধ্বস্ত পাঁশকুড়া ও কোলাঘাট ব্লকে বাংলা শস্যবিমার ক্ষতিপূরণ বিলিতে বিস্তর অনিয়ম হয়েছে। তা নিয়ে ২৮ জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী ও কৃষিমন্ত্রীকে স্মারকলিপি দিল কৃষক সংগ্রাম পরিষদ। পরিষদের সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক বলেন, একই পরিবারের বিভিন্ন উত্তরাধিকারীদের একই মৌজায় সমপরিমাণ জমি থাকলেও কোনও একজন আবেদনকারী যে পরিমাণ টাকা পেয়েছেন, অন্য একজন উত্তরাধিকারী তার থেকে কম টাকা পেয়েছেন, আবার কেউ কেউ এখনও কোনও টাকাই পাননি। অন্য দিকে যে সমস্ত মৌজায় মাছের ঝিল রয়েছে, তারা ওই ক্ষতিপূরণের টাকা পেলেও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত বহু কৃষক ক্ষতিপূরণ পাননি। কমিটির অভিযোগ, এ সম্পর্কিত কোনও তথ্য চাইলে বিমা কোম্পানির এজেন্ট বা কৃষি দপ্তর কোনও তথ্য বলতে চায় না, কলকাতার হেড অফিস দেখিয়ে দায় সারে। ফসল বিমা সংক্রান্ত সমস্ত রকম তথ্য আবেদনকারীর জানার জন্য একটি হেল্পলাইন চালুর দাবি জানিয়েছে কমিটি।

পঞ্চায়েতে কর্মী ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় জয়নগর-২ ব্লকের মণিরতট গ্রাম পঞ্চায়েতে কর্মরত এনআরএলএম প্রজেক্টের এক সঙ্ঘ কো-অর্ডিনেটর (এসসি)-কে মেয়াদ শেষের আগেই ছাঁটাই করা হয় এবং কুলতলী ব্লকের গোপালগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের একজন এবং কুন্দখালি-গোদাবর গ্রাম পঞ্চায়েতের একজন সিএসপি কর্মীকে শাসক দলের দলবাজির স্বার্থে ছাঁটাই করা হয় বলে অভিযোগ।

ছাঁটাই কর্মীদের পুনর্বহাল সহ সাত দফা দাবিতে এআইইউটিইউসি অনুমোদিত পশ্চিমবঙ্গ গ্রাম পঞ্চায়েত এসআরএলএমএসসি কর্মী ইউনিয়ন এবং পশ্চিমবঙ্গ এসআরএলএমসিএসপি কর্মী ইউনিয়নের যৌথ প্ল্যাটফর্ম 'আনন্দধারা এসসি-সিএসপি যৌথ মঞ্চ' ৩১ জানুয়ারি বারুইপুর মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দেয়।

এ দিন রেল মাঠে জমায়েত হয়ে বিক্ষোভকারীরা মিছিল করে মহকুমা শাসকের দফতরের সামনে এসে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। এসডিও অফিসের সামনের রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। এআইইউটিইউসি-র রাজ্য কাউন্সিল সদস্য মনিরুল ইসলামের নেতৃত্বে পাঁচজনের প্রতিনিধিদল মহকুমা শাসককে স্মারকলিপি দেয়। বিক্ষোভসভায় বক্তব্য রাখেন স্কিম ওয়ার্কার্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার নেত্রী রুণা পুরকাইত। এসসি কর্মী ইউনিয়নের সম্পাদিকা মহুয়া হালদার মণ্ডল এবং সিএসপি কর্মী ইউনিয়নের সম্পাদিকা নিবেদিতা দাস জানান, দাবি পূরণ না হলে আন্দোলন তীব্রতর করবেন তাঁরা।

'তোমাদের সঙ্গেই কাজ করতে চাই'

মহামিছিলের খবর নিয়ে প্রকাশিত গণদাবী বিক্রির সময় কলকাতার বেলেঘাটায় এক ভদ্রলোক কাগজটি হাতে নিয়েই আমাকে নমস্কার করলেন। ওঁকে বললাম, আপনি আমার থেকে বয়সে অনেক বড়, এইভাবে নমস্কার করবেন না। বললেন— আপনাকে না, আপনার আদর্শটাকে নমস্কার করলাম।

১২ জানুয়ারি বেলেঘাটা মনীষী স্মরণ কমিটি আয়োজিত বিবেকানন্দ ও সূর্য সেনের স্মরণ অনুষ্ঠান। কমিটির অন্যতম সদস্য একজনকে বক্তা ঠিক করেন। অনুষ্ঠানের সময় এসে দেখি উনি তো অন্য একটি বামপন্থী দলের সাথে যুক্ত, সেই দলের একটি গণফ্রন্টের রাজ্য কমিটির সদস্য! আমাদের অনুষ্ঠানের পর উনি আর এক অনুষ্ঠানে যান। পরদিন সেই বক্তা আমাকে ফোন করেন। বলেন, দুই জায়গায় অনুষ্ঠানের পার্থক্য আমি দেখলাম। তোমাদের কথা শুনতাম, আজ প্রমাণ পেলাম। আমি তোমাদের সাথেই কাজ করতে চাই।

একজন দোকানদারকে মিছিলে যাওয়ার জন্য বলেছিলাম। বলেছিলেন, চেষ্টা করবেন। মিছিলের পরে একদিন আমি তাঁকে বললাম, গেলে দেখতেন, খুব ভাল জমায়েত হয়েছিল। তখন উনি জমায়েতের শুরু থেকে কী কী হয়েছে আমাকে বলতে থাকলেন।

(জনৈক কর্মীর অভিজ্ঞতা)

পুনর্বাসনের দাবিতে ডিআরএম বিক্ষোভ

জাতীয় হকার আইন কার্যকর করে দোকানদারদের পুনর্বাসন দেওয়ার দাবিতে ২০ জানুয়ারি জাতীয় হকার দিবসে খড়্গপুর ডি আর এম অফিসে বিক্ষোভ ডেপুটেশনের কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের দোকানদার কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে। বিভিন্ন স্টেশন থেকে পাঁচ শতাধিক দোকানদার উপস্থিত হন। তাদের দাবি, পুনর্বাসন না দিয়ে উচ্ছেদ চলবে না। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন সমিতির সভাপতি শশাঙ্ক মাইতি, সহ সভাপতি শঙ্কর মালাকার, মধুসূদন বেরা, সুরঞ্জন মহাপাত্র। পাঁচ জনের প্রতিনিধি দল ডিআরএমের কাছে ডেপুটেশন দেয়। ডিআরএম দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন।

উন্নত পরিষেবার দাবিতে নন্দীগ্রাম হাসপাতালে বিক্ষোভ

এলাকার মানুষের দাবি সত্ত্বেও পূর্ব মেদিনীপুরে নন্দীগ্রাম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নাইট শেল্টার ও চিপ ক্যান্টিন চালু হয়নি। হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রোগীর পরিজনরা দুর্বৃত্তদের দাপটে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন, অথচ প্রশাসনের এ ব্যাপারে হেলদোল নেই। এ সবের বিরুদ্ধে উন্নত মানের ওষুধ ও চিকিৎসা পরিষেবা, হাসপাতালে ২৪ ঘণ্টা পরীক্ষার ব্যবস্থা, ওষুধের কাউন্টার বাড়ানো, হাসপাতালে নাইট শেল্টার, চিপ ক্যান্টিন চালুর দাবিতে ৩০ জানুয়ারি হাসপাতাল মোড়ে অবস্থান ও সিএমওএইচ অফিসে বিক্ষোভ দেখায় এস ইউ সি আই (সি) -র নন্দীগ্রাম লোকাল কমিটি। বক্তব্য রাখেন লোকাল কমিটির সম্পাদক মনোজ কুমার দাস, বিমল মাইতি, প্রলয় খাটুয়া প্রমুখ। এর পর সিএমওএইচ দফতর ও হাসপাতাল সুপারের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। সুপার দাবি পূরণে উদ্যোগ নেওয়ার আশ্বাস দেন।

ঘাটশিলায় এআইডিএসও-র রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির

সমাজ পরিবর্তনের পরিপূরক শিক্ষা সংস্কৃতি মনুষ্যত্ব রক্ষার আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে সংগ্রামের ৭ দশক পূর্তিতে এআইডিএসও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির আহ্বানে ২৫-২৭ জানুয়ারি ঝাড়খণ্ডের ঘাটশিলাতে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ কমরেড শিবদাস ঘোষ চিন্তাধারা অধ্যয়ন কেন্দ্রে এআইডিএসও-র রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির হয়।

পরিচালনা করেন সংগঠনের প্রাক্তন সর্বভারতীয় নেতা ও এস ইউ সি আই (সি) পলিটবুরো সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। কমরেড শিবদাস ঘোষের মূর্তিতে মাল্যদান করে প্রথমে শ্রদ্ধা জানান তিনি।

উপস্থিত ছিলেন এসইউসিআই(সি) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড সুভাষ দাশগুপ্ত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেডস নভেন্দু পাল, কমল সাঁই, এআইডিএসও-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবাশিস প্রহরাজ, কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সভাপতি কমরেড সৌরভ ঘোষ, কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সহ-সভাপতি কমরেড মৃদুল সরকার, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি কমরেড মণিশঙ্কর পট্টনায়ক, রাজ্য সম্পাদক কমরেড বিশ্বজিৎ রায়।

অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে কর্মী নিয়োগের দাবিতে বিক্ষোভ কোচবিহারে

এআইইউটিইউসি অনুমোদিত ওয়েস্টবেঙ্গল অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড হেল্পার্স ইউনিয়নের কোচবিহার জেলা কমিটির নেতৃত্বে ২৪ জানুয়ারি জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক দফতরে বিক্ষোভ দেখান কর্মীরা। তাঁদের দাবি— অবিলম্বে সমস্ত কর্মীদের অ্যান্ড্রোয়েড ফোন দিতে হবে, প্রতিটি সেন্টারের নামে মোবাইল সিম বরাদ্দ করতে হবে এবং তার যাবতীয় রিচার্জ সরকারিভাবে করতে হবে, না হলে পোষণের যাবতীয় কাজ বন্ধ রাখতে হবে। সেন্টারগুলোর স্থায়ী পরিকাঠামো উন্নত করতে হবে। বাজারদরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ডিম, সবজি, জ্বালানির বিল দিতে হবে। শীতকালে সেন্টারের সময় সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত করতে হবে। সমস্ত শূন্য সেন্টারে কর্মী নিয়োগ ও সমস্ত কর্মীদের স্থায়ীকরণ করে ন্যূনতম মাসিক ভাতা ২৮ হাজার টাকা করতে হবে।

এ দিন সহস্রাধিক কর্মী কোচবিহারে সাগরদিঘি চত্বরে সমবেত হয়ে মিছিল করে জেলাশাসক দফতরে যান এবং দাবিপত্র অতিরিক্ত জেলাশাসকের হাতে তুলে দেন। অতিরিক্ত জেলাশাসক দাবি পূরণে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের আশ্বাস দেন। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা অফিস সম্পাদক রীণা ঘোষ, মমতা সরকার দাস, পম্পা চৌধুরী প্রমুখ।

পাঠকের মতামত

মোবাইলের হাতছানিতে বিপন্ন শৈশব

আমার দীর্ঘদিনের পরিচিত এক যুবকের সমস্যা শুনে হতবাক হয়ে গেলাম। তার সঙ্গে দেখা হতে সে আমার হাত ধরে ঝরঝর করে কাঁদতে শুরু করল। বললাম, 'কী হয়েছে তোর'? সে যা বলল তা আমাকেও তাৎক্ষণিকভাবে বিপর্যস্ত করেছিল। সমস্যাটা মোবাইল নিয়ে। 'মোবাইল' যন্ত্রটি এখন মানুষের জীবনের সাথে গভীর ভাবে যুক্ত হয়ে গিয়েছে, বিশেষত মধ্যবিত্ত জীবনের সাথে। মায়েরা শিশুদের শান্ত রাখতে বিশেষ করে বাচ্চাকে খাওয়ানোর যে পরিশ্রম সেটা এড়াতে মোবাইল হাতে ধরিয়ে দিচ্ছে। এর ফলে অধিকাংশ শিশু ওই বয়স থেকেই ধীরে ধীরে এর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ছে। অল্প বয়সে শিশুদের কৌতূহল প্রচুর। অপার বিস্ময়ে সে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও প্রাকৃতিক জগতের সাথে অতি দ্রুত পরিচিত হতে থাকে। এই সময় মোবাইলে তার আসক্তি জন্মালে সে প্রতিনিয়ত মোবাইল নিয়ে ঘঁটতে থাকে। বিভিন্ন আইকন বা বোতাম টিপে নতুন নতুন জগত বা সাইটে প্রবেশ করতে থাকে। নতুন নতুন খেলা বা কার্টুনের সিরিজ দেখতে দেখতেই কখন সে নিজের অজান্তেই যে হাজার হাজার পর্নোগ্রাফিক সাইট আছে তার মধ্যে ঢুকে পড়ছে, সে নিজেও জানে না। প্রথম প্রথম অবাক হলেও আস্তে আস্তে এই পর্নোগ্রাফি তাকে আসক্ত করে তোলে। আজকাল মনোবিদরাও এটা লক্ষ করেছেন যে, সাত আট বছর বয়স থেকেই শিশুরা ক্রমশ পর্নোগ্রাফিক সাইটে ঢুকে পড়তে শুরু করছে, বিশেষ করে যে সব বাড়িতে অভিভাবকদের নজরদারি কম এবং যে সমস্ত অভিভাবকরা নিজেদের চাকরি, জীবিকা বা ব্যক্তিগত কাজ নিয়ে বেশি ব্যস্ত থাকেন। তাদের পক্ষে সন্তানদের প্রতি মনোযোগ দেওয়া খুব কঠিন হয়ে ওঠে। অভিভাবকের সাহচর্যের অভাব শিশুদের মোবাইলের প্রতি আকর্ষণ আরও বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করছে।

আমার পরিচিত ওই যুবকের ন'বছরের মেয়েটি মোবাইল ঘাঁটতে ঘাঁটতে কখন পর্নোগ্রাফিতে আসক্ত হয়ে পড়েছে, সেটা এই যুবক বা তার স্ত্রী বুঝতে পারেনি। প্রতিবেশী এক মহিলা এসে জানালেন এই ছোট মেয়েটি তার দশ বছরের ছেলের সঙ্গে একসাথে পর্নোগ্রাফি দেখছে এবং তিনি লক্ষ করেছেন, পর্নোগ্রাফি দেখতে দেখতে মেয়েটি যৌন উত্তেজনা জাগানোর মতো করে ছেলেটির শরীরে হাত দিচ্ছে। এটি দেখে তিনি দু-জনকেই খুব বকাবকি করেন এবং কীভাবে এটা ঘটছে বোঝার চেষ্টা করেন। জানতে পারেন বেশ কিছুদিন ধরেই এটা ঘটছে।

এই মেয়েটি শিশু বয়সে ভালো গান গাইত, ছবিও আঁকতে পারত। অভয়ার হত্যাকাণ্ডের পর অরিজিৎ সিংয়ের 'আর কবে আর কবে' গানটি মুখে মুখে অনেকের কাছে শুনে, সে তুলে ফেলেছে। কিন্তু তার সৃজনশীল ক্ষমতা আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই বলে যুবকটি কাঁদতে কাঁদতেই বলল, 'দাদা আমি আমার একমাত্র মেয়েকে কীভাবে বাঁচাবো, আপনি বলে দিন।'

আমি প্রথমে তাকে শান্ত করার চেষ্টা করলাম। বললাম, 'তুই তো জানিস এই সমস্যা আজ সমাজে সর্বব্যাপক। এটা একটা সামাজিক সমস্যা, কিন্তু যখন আমাদের নিজেদের ঘরে চলে আসে, তখন আমরা এটাকে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সমস্যা বলে মনে করি। এটা অত্যন্ত ভুল চিন্তা। বললাম, ওদের বাঁচাতে হলে ওদের সৃজনশীল ক্ষমতা ও ভাল দিকগুলোকে উৎসাহিত করা দরকার। সাথে সাথে দরকার শরীরচর্চা ও খেলাধূলা, ভাল ভাল গল্প পড়ে শোনানো, ছোটদের বইপত্র কিনে দেওয়া। এর সাথে অবশ্যই প্রয়োজন নবজাগরণ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের সমস্ত মনীষীদের, বিপ্লবীদের জীবনের কথা জানা। এই কথাটাই আমাদের দলের বর্তমান সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ প্রতিটি সভায়, এমনকি প্রকাশ্য জনসভায় শুধু কর্মীদের নন, সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন করছেন, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ধ্বংস হওয়ার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য। তোর মতো অন্যান্য অভিভাবকও এই ধরনের সমস্যায় ভুগছেন। তোরা স্বামী, স্ত্রী দু-জনে মিলে তোদের মেয়ের সৃজনশীল ক্ষমতা, গান এবং আঁকা এগুলোকে উৎসাহিত কর। সাথে সাথে সপ্তাহে অন্তত একটা দিন, সম্ভব হলে প্রতিদিন শরীরচর্চা ও খেলাধূলার জন্য সময় দে। পরে জানা যায়, মেয়েটির সৃজনশীল দিকগুলোর প্রতি স্বামী, স্ত্রী দু-জনেই যত্ন নিচ্ছে এবং ধীরে ধীরে মেয়েটির অবস্থার উন্নতি ঘটছে।

দেবাশিস রায়, বি গার্ডেন, হাওড়া

২১ জানুয়ারি মহামিছিল 'ওই দেখো জনতা পায়ে পায়ে এগিয়ে চলে'

'সংগ্রামী জনতা শেষ কথা বলে'

মহামিছিল শেষে বন্ধুরা মিলে একটা চায়ের দোকানে গেছি। পাশের বেঞ্চ থেকে দু'জনের কথোপকথন কানে এল।

প্রথম জন বলছেন, বাপ রে কী বিশাল মিছিল, এত লোক!

দ্বিতীয় জন বললেন, এত বড় মিছিল ইদানিং দেখিনি রে!

প্রথম জন ঃ এসইউসির এত লোক! সত্যিই অবাক করার মতো। সরকারি দল নয়, এমএলএ-এমপি নেই, কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা নেই, তবুও এসইউসির ডাকে এত লোক! গ্রামের গরিব মানুষও ছিল প্রচুর সংখ্যায়।

দ্বিতীয় জন ঃ হুম, আর মিছিলের স্লোগানের জোর দেখেছিস, একেবারে ভেতর থেকে এলে যেমন হয়!

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে ওঁদের কথার মাঝে ঢুকে পড়লাম। বললাম, বড় মিছিল ঠিকই। তবে দাদা, এই রকম বড় মিছিল অন্যান্য সরকারি দলগুলো অনায়াসে করতে পারবে।

দ্বিতীয় ব্যক্তিটি তখন আমার দিকে মুখটা ফিরিয়ে একটু বিরক্ত হয়ে বললেন— দাদা সে তারা করবে ক্ষমতার জোরে, কিছু পাওয়ার লোভ দেখিয়ে, কিন্তু এরা তা নয়। আর একটা কথা বলি, আপনার থেকে বয়সে আমি বেশ কিছুটা বড়, নানা সরকারি দলের এমনকি অন্য বামপন্থী দলেরও অনেক বড় মিছিল দেখেছি কিন্তু এত বলিষ্ঠতা খুব একটা দেখিনি। ইদানিং তো নয়ই। ওইসব মিছিলে লোক গল্প করতে করতে, হাসতে হাসতে হেঁটে যায়। এখানে পুরো মিছিলে একবারের জন্যও তা দেখলাম না। কথা না বাড়িয়ে চায়ের দাম মিটিয়ে দোকান থেকে সবাই বেরিয়ে এলাম। কারও মুখেই কোনও কথা নেই, হয়তো আমার মতো ওদেরও মনে ওই কথাবার্তারই রেশ বয়ে চলেছে।

বাসে বসে ভাবছি, আমরা মিছিলে হেঁটে যা দেখতে পাইনি ওই দু'জন মিছিলের বাইরে থেকে সেটা দেখতে পেয়েছেন। ওঁরা দেখেছেন— মিছিলের প্রাণ। শুধুমাত্র জনপ্লাবনেই কোনও মিছিল জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে না। মিছিল জীবন্ত হয়ে ওঠে প্রাণের স্পন্দনে, যা ফুটে বেরিয়েছে মিছিলের দাবিতে, তার স্লোগান তোলার ভঙ্গিতে। ওই দু'জনের মতোই রাস্তার দু'ধারে বাড়ির বারান্দা, ঘরের জানলা থেকে উঁকি দিয়ে, আটকে যাওয়া বাসে বসে-দাঁড়িয়ে যাঁরাই এই মিছিল দেখেছেন, একুশে জানুয়ারির মহামিছিলের বিশালতা, তার দৃপ্তভঙ্গি তাঁদের প্রত্যেকের প্রতিবাদী সত্তাকে, বিবেককে স্পর্শ করেছে। আর করেছে বলেই তাঁরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মিছিল দেখেছেন কিন্তু একবারের জন্যও তা ভেঙে রাস্তা পার হওয়ার কথা ভাবেননি।

বাড়ি ফিরেছি, হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠলো। একটা অচেনা নম্বর থেকে ফোন। ধরলাম। অপর প্রান্ত থেকে একজন বললেন— আমি অমুক বলছি। নামটা শুনে চমকে উঠলাম। বিগত সরকারি দলের এলাকার এক নামকরা নেতা। বললেন, চিনতে পারছো? একটু অবাক হয়েই বললাম, হ্যাঁ পারছি, বলুন। বললেন, আজ দারুণ মিছিল হয়েছে তোমাদের। খুব ভাল লাগল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় দেখলেন? উত্তর দিলেন, ফিল্ডেই দেখেছি। রাস্তাতেই ছিলাম। অনেকদিন বাদে একটা ভাল মিছিল দেখলাম। খুবই বলিষ্ঠ মিছিল হয়েছে ভাই। ইদানীং এ রকম মিছিল আমি অন্তত দেখিনি। আমি বামপন্থী, তোমরাও বামপন্থী পার্টি। তাই ভাবলাম তোমাদের কনগ্র্যাচুলেট করা উচিত। তাই লাইব্রেরি থেকে তোমার ফোন নম্বর জোগাড় করে কল করলাম। ভাল থেকো, এগিয়ে চলো।

ফোনটা শেষ হওয়ার পর ভাবছি— সংগ্রামী জনতার একটা বলিষ্ঠ মিছিল কী ভাবে মানুষকে নাড়া দিয়ে যায়, হতাশা কাটিয়ে তাকে সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে! হঠাৎ মনের মধ্যে একটা গানের সুর ভেসে উঠল— 'ওই দেখো জনতা পায়ে পায়ে এগিয়ে চলে স্লোগান তুলে/শাসকের দম্ভ চূর্ণ করে সংগ্রামী জনতা শেষ কথা বলে।'

বিপু ভট্টাচার্য, বরানগর

এখনও মিছিলের শেষ দেখতে পাচ্ছি না

মিছিলটা তখন দৃপ্ত ভাবে এগিয়ে চলছে, ধর্মতলার দিকে। ওয়েলিংটন মোড়ে আমি তখন আটকে থাকা মানুষের মধ্যেই। কতক্ষণ চলছে জানতে চাইলে এক পুলিশ কর্মী বললেন, মিনিট চল্লিশ তো মিছিলটা চলছেই। এখনও এর শেষ আমরা দেখতে পাচ্ছি না। বললেন, ভীষণ ভাল লাগছে। এমন সুসজ্জিত মিছিল, বিশেষ করে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যেভাবে গলা মেলাচ্ছে এবং বাবা মায়ের হাত ধরে হাঁটছে সত্যিই অবাক হচ্ছি। জিজ্ঞেস করলাম, মিছিলের লোক সংখ্যা প্রায় কি ৪০-৫০ হাজার হতে পারে। পুলিশ কর্মীটি বলে উঠলেন, অনেক বেশি— ৭০ থেকে ৮০ হাজার। বললেন, অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, কাল কোনও কাগজে এর খবর পাবেন না। বললেন, আমার নিজের জেলা থেকে নানা রকমের ব্যানার প্ল্যাকার্ড নিয়ে লোকজন হাঁটছেন দেখে ভালো লাগছে।

দীনেশ মেইকাপ, পূর্ব মেদিনীপুর

ভরসা বেড়ে গেল

মিছিলের পরদিন ওয়েলিংটনে হেলমেট ও সিট কভারের দোকানের কর্মীরা ডেকে বললেন, দিদি আপনাদের মিছিল খুব ভাল হয়েছে। মিছিলে সাধারণ মানুষ এবং মহিলাদের সংখ্যা ছিল চোখে পড়ার মতো। আর সব থেকে বেশি ভাল লেগেছে আপনাদের মিছিলের মধ্যে লাল পতাকার পতপত করে ওড়া দেখে। যুবক-ছাত্র-ছাত্রী, অনেক প্রবীণ মানুষ, অন্ধ মানুষ, লাঠি হাতে মানুষও হাঁটছেন আপনাদের মিছিলে। মিছিলের দাবিগুলি তো আমাদেরই।

আমার মনের মধ্যে এক সুন্দর অনুভূতি হল। ওঁদের সঙ্গে কথা বলে চলে আসছি, এক তরুণ দৌড়ে এসে বললেন, আপনাদের মিছিল এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে গেছে। ওর সঙ্গে কথা বলতে বলতে আরও একজন যুবক এগিয়ে এলেন। তিনিও বললেন, দিদি আপনাদের মিছিলে এত মানুষ দেখে মনে অনেক জোর পেলাম। আপনাদের দলই পারবে সমস্ত মানুষকে এক করে লড়াই করতে।

মন্দিরা দাস দাস, ভবানীপুর

জীবনের সঙ্গে মিলে যাওয়া দাবি

এবারের মহামিছিলের দাবিগুলি যেন মানুষের মনের ভেতরে গিয়ে তাদের জীবনের সঙ্গে মিলে গেছে। মিলে যাওয়ার আবেগ থেকেই ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে অনেক কথা। বিচার পায়নি অভয়া, বিচার পায়নি সাধারণ মানুষও। মূল্যবৃদ্ধি, শিক্ষার ভয়াবহ অবস্থা, স্মার্ট মিটার চালু ও বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধিতে জীবন জেরবার। তাই গরিব ও সাধারণ মানুষের মধ্যে দলের কর্মীরা যখন প্রচার করছে, টাকা পয়সা সংগ্রহ করছে আন্দোলনের তহবিলে, তখন সাধারণ মানুষ তো বটেই, শাসক দলের পঞ্চায়েত মেম্বার ও তাঁর স্ত্রীও বলেছেন, জনগণের দাবি নিয়ে লড়ছো তোমরাই। মহামিছিলের প্রচার আন্দোলনের পরিবেশ তৈরি করেছে। আন্দোলনের প্রচার নানা সুবিধাবাদের বাঁধনকে আলগা করে দিয়েছে। সিপিএমের কেউ কেউ বলছেন, রাস্তায় তোমরাই আছো, আন্দোলন তোমরাই করছো। বোঝা যায়, মহামিছিল মানুষের মনের উপর একটা গভীর ছাপ ফেলেছে।

গোপাল সাহু, বারুইপুর

সঙ্কট থেকে রেহাই পেতে ব্যর্থ চেষ্টা

একের পাতার পর

কর্মসংস্থানের কোনও দিশা বাজেটে নেই। সরকারের ভাবনা, করছাড়ের ফলে মানুষের হাতে যে অতিরিক্ত অর্থ আসবে তা বাড়ি-গাড়ি-ভোগ্যপণ্য এবং পরিষেবায় ব্যয় হবে। তার ফলে যে অতিরিক্ত চাহিদা তৈরি হবে তা পূরণের জন্য উৎপাদন পরিকাঠামো বাড়ানোর প্রয়োজন হবে এবং তাতেই কর্মসংস্থান ঘটবে। এই দায়িত্বটুকুও বেসরকারি সংস্থাগুলির উপর চাপিয়ে হাত ধুয়ে ফেলেছেন প্রধানমন্ত্রীর বকলমে অর্থমন্ত্রী। অর্থাৎ কর্মসংস্থানের প্রশ্নে সরকারের নীতি 'গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল'-এর। যদি মধ্যবিত্ত করছাড়ে উদ্বৃত্ত অর্থ পণ্য ও পরিষেবা কেনায় ব্যয় করে তবে খানিকটা কর্মসংস্থান ঘটবে। এমন কাল্পনিক ভাবনার উপর বেকার সমস্যার মতো গুরুতর সমস্যার সমাধানের কথা ভাবে যে সরকার তারা যে আসলে বাস্তব পরিস্থিতিটাকে স্রেফ চোখ বুজে থেকে অস্বীকার করার মতো হাস্যকর চেষ্টা করছে, তা কাউকে বুঝিয়ে বলার দরকার হয় না।

দেখা যাক, মধ্যবিত্তের হাতের এই অতিরিক্ত অর্থটুকুর কেনার ক্ষমতা বাড়ানোর সম্ভাবনা কতখানি। মূল্যবৃদ্ধির চাপে মানুষ হাঁসফাঁস করছে। খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি থেকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবায় খরচ বেড়ে চলেছে মাত্রাছাড়া হারে। ঘরে ঘরে ছেলেমেয়েরা বেকার। এই অবস্থায় আয়কর ছাড়ে যতটুকু সাশ্রয় হবে তার বড় অংশ মূল্যবৃদ্ধির খাঁই মেটাতেই খরচ হয়ে যাবে। অবশিষ্টটুকুর মধ্যে কতটুকু মানুষ ভোগ্যপণ্যের পিছনে ব্যয় করবে?

মধ্যবিত্তের উপরের বড় একটি অংশের রোজগার যথেষ্ট বেশি। ভোগ্যপণ্যের পিছনে ব্যয়ের জন্য তাঁদের করছাড়ের উপর নির্ভর করার প্রয়োজন হয় না। নানা আর্থিক সমীক্ষায় দেখা গেছে, এই অংশের মানুষ হাতে অতিরিক্ত অর্থ এলে তা সঞ্চয় করেন বা শেয়ার কেনেন। অর্থাৎ এই তিন শতাংশের কাছাকাছি মানুষের হাতে কয়েক হাজার টাকা অতিরিক্ত এলে তা দিয়ে যে বাজার চাঙ্গা হয় না, এটা বোঝার ক্ষমতা তাঁদের মাইনে করা আমলা-অর্থনীতিবিদদের অন্তত আছে। তা হলে তারা এটা করল কেন? তার কারণ, একদিকে সামনের দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে চাকরিজীবী মানুষদের খুশি করে ভোট পাওয়ার সম্ভাবনা, অন্য দিকে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত এই অংশটিকেই তারা যে হেতু জনমত গড়ার কারিগর মনে করে, তাই তাদের তুষ্ট রাখা। তা ছাড়া আর একটি উদ্দেশ্য হল, করছাড়ের দামামা বাজিয়ে সমাজের অন্য বড় অংশের মানুষের বঞ্চনাকে ঢেকে ফেলার চেষ্টা করা। কিন্তু যা কঠিন বাস্তব, তাকে কি এই প্রতারণা দিয়ে বিজেপি নেতাদের পক্ষে ঢাকা সম্ভব হবে?

বিজেপি সরকারের এই বাজেট আসলে কাদের পক্ষে তা আরও খানিকটা স্পষ্ট হবে বাজেটের কর্পোরেট সেবার দৃষ্টিভঙ্গিটা খেয়াল করলেই। ২০১৯-এ কর্পোরেট করের হার বিজেপি সরকার ৩৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে করেছিল ২২ শতাংশ। তখনও সরকারের অজুহাত ছিল এর ফলে সাশ্রয় হওয়া অংশ দিয়ে লগ্নি বাড়াবে তারা। বাস্তবে একই কারণে, অর্থাৎ বাজারে চাহিদা না থাকায় লগ্নি মুনাফা আকারে ফিরে না আসার আশঙ্কা থেকেই তারা লগ্নি করেনি। দীর্ঘ দিন ধরেই এমনকি পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিশেষজ্ঞরাও দাবি করছিলেন, জনগণের হাতে আরও অর্থ তুলে দিতে অতিধনীদের উপর সম্পদ কর চাপানো হোক। কিন্তু সরকার সম্পদ কর চাপানো দূরের কথা, কর্পোরেট করের পরিমাণটুকুও বাড়াল না। বরং তা ব্যক্তিগত করদাতাদের সর্বোচ্চ হার ৩০ শতাংশের থেকে অনেক কমই রেখে দিয়েছে। এর দ্বারা কর্পোরেট মহলকে তুষ্ট রেখে তাদের আশীর্বাদ অব্যাহত রাখার কাজটিই করেছে বিজেপি সরকার।

বাস্তবে দেশের যে বাকি ৯০ শতাংশ সাধারণ মানুষ, যারাই বাজারের সব চেয়ে বেশি সংখ্যক ক্রেতা, যাদের রোজগার কম, আয়করের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই, যাদের হাতে অর্থের পরিমাণ বাড়লেই একমাত্র অর্থনীতি সত্যি সত্যিই চাঙ্গা হতে পারত, তাদের কেনার ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য এই বাজেটে সরকার কোনও পদক্ষেপই করেনি। উপরন্তু করছাড় দেওয়ার মধ্য দিয়ে যে ১ লক্ষ কোটি টাকা রাজস্ব সরকারের কম আয় হচ্ছে, তা এই বঞ্চিত জনগণের ঘাড়ের উপরই চাপিয়েছে সরকার। এই টাকা জোগাড় করতে কেন্দ্রীয় সাহায্যে চলা সরকারি প্রকল্পে প্রায় ৯০ হাজার কোটি টাকা খরচ ছাঁটাই করেছে তারা। রাজ্যগুলির জন্য অর্থ কমিশনের অনুদান প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকা কমিয়েছে। এর ফলে সাধারণ মানুষের জন্য সরকারি বরাদ্দ যে ছিটেফোঁটাটুকু জুটত সেটুকুও আর মিলবে না।

"সমাজতন্ত্র একদিন এই সমস্ত সমস্যার সমাধান করে দেখিয়েছিল। সেই ব্যবস্থায় উৎপাদনের উদ্দেশ্য মুষ্টিমেয় মালিকের মুনাফা বাড়ানোর পরিবর্তে ছিল সমস্ত দেশবাসীর প্রয়োজন মেটানো। তাই সেখানে বাজারসঙ্কট দেখা দেয়নি। সব মানুষের প্রয়োজন মেটাতে বিপুল উৎপাদনের জন্য বিপুল কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছিল সেই ব্যবস্থায়। উৎপাদন থেকে কারও মুনাফা লোটার সুযোগ ছিল না, তাই মূল্যবৃদ্ধির সঙ্কটও সেখানে দেখা দেয়নি। সমাজতন্ত্র শ্রম-সময় আট ঘণ্টা থেকে কমিয়ে প্রথমে সাত এবং পরে ছ'ঘণ্টায় নিয়ে গিয়েছিল। অত্যাধুনিক যন্ত্রের ব্যবহার সেখানে মানুষের কাজ কেড়ে নিত না, বরং কায়িক শ্রম লাঘব করত এবং শ্রম সময় কমিয়ে সেই সময়কে অন্য সৃষ্টিশীল কাজে ব্যবহারের সুযোগ করে দিত।

বেকারত্ব গত ৫০ বছরে সর্বাধিক মাত্রায় পৌঁছেছে। বেকারদের জন্য এই বাজেট কী দিল? কিছুই না। সরকার যতই মাঝারি ও ছোট সংস্থাগুলিকে উৎসাহ দেওয়ার কথা বলুক, প্রযুক্তির অসাধারণ উন্নতির বর্তমান সময়ে বড় শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পাল্লা দেওয়া এই সংস্থাগুলির পক্ষে সম্ভব নয়। তাই এই ধরনের সংস্থাগুলি প্রায়শই মুখ থুবড়ে পড়ছে। অন্য দিকে কর্পোরেট সংস্থাগুলির মুনাফা বিপুল অঙ্কে বাড়লেও এই সংস্থাগুলি একদিকে যেমন নতুন কর্মী নিয়োগের পরিবর্তে কৃত্রিম মেধা এবং রোবট ব্যবহারের দিকে ঝুঁকছে, তেমনই এমনকি কর্মীদের সামান্য বেতন বাড়াতেও তারা রাজি হচ্ছে না।

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এই বাজেটের লক্ষ্য সরকারের কোষাগার ভরানো নয়, নাগরিকের পকেট ভরানো। সেই নাগরিক কারা প্রধানমন্ত্রীজি? দেশের ৯০ ভাগ মানুষ কি তা হলে সেই নাগরিক নন? তাদের জীবনমানের উন্নয়নের জন্য বাজেটে কোনও পদক্ষেপের কথাই নেই কেন? অথচ এই প্রধানমন্ত্রীই একদিন বুক বাজিয়ে বলেছিলেন, তাঁর লক্ষ্য 'সব কা সাথ সব কা বিকাশ'—সবার পাশে থেকে সবার বিকাশ ঘটানো। এটা কি তিনি তা হলে সে দিন দেশের মানুষকে শুধু ধোঁকা দিতেই বলেছিলেন? সরকারি নীতিতে আর্থিক বৈষম্য আজ আকাশ ছুঁয়েছে। কর্পোরেট মুনাফা গত ১৫ বছরের রেকর্ড ভেঙে ফেলেছে। তা সত্ত্বেও তাদের উপর 'করের চাপ' বাড়াননি প্রধানমন্ত্রী। বাস্তবে একচেটিয়া পুঁজিকে অবাধ লুঠের ব্যবস্থা করে দেওয়ার যে রাস্তায় চলছে মোদি সরকার, তাতে জনগণের সঙ্গে প্রতারণার রাস্তা নেওয়া ছাড়া তাদের কিছু করার নেই। আমরা মার্ক্সবাদীরা বরাবরই যে কথা বলেছি যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সরকারগুলি আসলে পুঁজিপতি শ্রেণির রাজনৈতিক ম্যানেজারের ভূমিকা পালন করে। পুঁজিপতিদের জন্য সর্বোচ্চ মুনাফার ব্যবস্থা করে দেওয়াই এই সব সরকারগুলির কাজ। তাই জনগণ যখন দারিদ্রের অতলে তলিয়ে যাচ্ছে তখনও পুঁজিপতি শ্রেণির মুনাফা অতীতের সব রেকর্ড ছাপিয়ে যাচ্ছে। এই ঘটনা আমাদের বক্তব্যের সত্যতাই প্রমাণ করছে।

সরকারি নীতিতে যে ভাবে বৈষম্য বাড়ছে তাতে এই ব্যবস্থার সেবা করে জনগণের কোনও সমস্যারই সমাধান করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। তবে কি এই ধনবৈষম্য সত্যিই দূর করা সম্ভব নয়? সমস্ত বেকারের হাতে কাজ দেওয়া কি সত্যিই অসম্ভব? কোনও উপায়েই কি সমাজের সব মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়তে পারে? হ্যাঁ পারে। সমাজতন্ত্র একদিন এই সমস্ত সমস্যার সমাধান করে দেখিয়েছিল।

সেই ব্যবস্থায় উৎপাদনের উদ্দেশ্য মুষ্টিমেয় মালিকের মুনাফা বাড়ানোর পরিবর্তে ছিল সমস্ত দেশবাসীর প্রয়োজন মেটানো। তাই সেখানে বাজারসঙ্কট দেখা দেয়নি। সব মানুষের প্রয়োজন মেটাতে বিপুল উৎপাদনের জন্য বিপুল কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছিল সেই ব্যবস্থায়। উৎপাদন থেকে কারও মুনাফা লোটার সুযোগ ছিল না, তাই মূল্যবৃদ্ধির সঙ্কটও সেখানে কোনও দিন দেখা দেয়নি। বর্তমানে কেন্দ্র-রাজ্য সব সরকারই পুঁজিপতিদের মুনাফা বাড়াতে শ্রম-সময় আট ঘণ্টার পরিবর্তে ১০-১২ ঘণ্টায় নিয়ে যাচ্ছে। সমাজতন্ত্র শ্রম-সময় আট ঘণ্টা থেকে কমিয়ে প্রথমে সাত এবং পরে ছ'ঘণ্টায় নিয়ে গিয়েছিল। পরিকল্পনা ছিল তা আরও কমিয়ে আনার। অত্যাধুনিক যন্ত্রের ব্যবহার সেখানে মানুষের কাজ কেড়ে নিত না, বরং কায়িক শ্রম লাঘব করত এবং শ্রম সময় কমিয়ে সেই সময়কে অন্য সৃষ্টিশীল কাজে ব্যবহারের সুযোগ করে দিত। আজ যদি পুঁজিবাদের এই ভয়ঙ্কর বাজারসঙ্কট থেকে রেহাই পেতে হয় তা হলে উৎপাদনকে সর্বোচ্চ মুনাফার ফাঁস থেকে মুক্ত করতে হবে। এ ছাড়া অন্য কোনও রাস্তা নেই। বাস্তবে মোদি সরকার কেনার ক্ষমতা বাড়ানোর নামে বাজেটে যে যে পদক্ষেপ নিয়েছে, তাতে সমস্যা কমা দূরের কথা, আরও বাড়তেই থাকবে। কারণ সঙ্কটের কারণটিকে টিকিয়ে রেখে সঙ্কট-মুক্তি ঘটানো যায় না।

এই বাজেট জনবিরোধী, একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থবাহী

কেন্দ্রীয় বাজেট-২০২৫ সম্পর্কে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এস ইউ সি আই (সি)-র সাধারণ সম্পাদক প্রভাস ঘোষ ১ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন,

প্রত্যাশিত ভাবেই এ বারের বাজেটে পরিসংখ্যানের ভেলকি ও দ্ব্যর্থবোধক বাক্যের মধ্য দিয়ে বিজেপি সরকারের সাফল্যের মিথ্যা দাবি নিয়ে গতানুগতিক কোলাহল লক্ষ করা গেল। জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি নিয়ে এই বাজেটে একটিও কথা নেই। কর্মসংস্থান ও সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি সম্পর্কে এই বাজেটে যা বলা হল, তা গত বাজেটে ঘোষিত যে প্রস্তাবগুলি ইতিমধ্যেই ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে, তার থেকে আলাদা কিছু নয়। এ বারের বাজেটের মূল দিকটি হল আরও বেসরকারিকরণের দিকে নির্দিষ্ট ঝোঁক—পিপিপি মডেলের ব্যাপক প্রয়োগ, বিমা ক্ষেত্রে একশো শতাংশ এফডিআই এবং বেসরকারি মালিকদের হাতে সরকারি পরিকাঠামো তুলে দেওয়ার ভিতর দিয়ে যা সামনে এসেছে। স্বাস্থ্য-শিক্ষা-কৃষি সহ অন্যান্য ক্ষেত্রগুলিতে সুনির্দিষ্ট বরাদ্দের বিষয়টি বাজেটে সযত্নে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।

শুধুমাত্র ব্যক্তিগত কর-হার কমানোর মলম লাগিয়ে ক্রয়ক্ষমতার অভাবে ভোগ্যপণ্যের বিক্রি কমে যাওয়া রোখা ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের ক্ষোভ প্রশমিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। বিহারে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন মাথায় রেখে জোটসঙ্গী নীতীশ কুমারকে সন্তুষ্ট করতে শুধু কয়েকটি প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছে।

বাজেটের নামে এই উপহাসের তীব্র নিন্দা করে সম্পূর্ণ জনস্বার্থবিরোধী ও একচেটিয়া-স্বার্থবাহী এই আর্থিক দলিলের বিরুদ্ধে দুর্দশা-জর্জরিত দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2025-27

গণদাবী GANADABI Volume: 77, No.: 26 Bengali Weekly February 7, 2025 Kolkata Price: Rs. 3.00

সংগ্রহ করুন

শহিদ দীনেশ মজুমদারের নামে রাস্তা বসিরহাটে

স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন ধারার সৈনিক শহিদ দীনেশ মজুমদার ছিলেন অত্যাচারী ব্রিটিশ পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট হত্যা প্রচেষ্টা ও চন্দননগরের পুলিশ কমিশনার মঁসিয়ে কুইঁ হত্যার নায়ক। তাঁর জন্মভিটা উত্তর ২৪ পরগণায় বসিরহাটের পুরাতন বাজার নিমতলায়। সেখানকার ৬ কিমি দীর্ঘ ইটিন্ডা রোডের নতুন নামকরণ শহিদ দীনেশ মজুমদার রোড করার দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চালাচ্ছে বসিরহাটের শহিদ দীনেশ মজুমদার স্মৃতিরক্ষা কমিটি। ধারাবাহিক আন্দোলনের চাপে সম্প্রতি রাস্তাটির নাম পরিবর্তন করতে বাধ্য হল প্রশাসন। কমিটি শহিদের জন্মভিটাকে হেরিটেজ ঘোষণা ও সেখানে একটি মিউজিয়াম তৈরির দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

ম্যানহোলে শ্রমিক মৃত্যুর দায় সরকারেরই

২ ফেব্রুয়ারি বানতলার চর্মনগরীতে ম্যানহোলে নেমে ৩ জন ঠিকা শ্রমিকের মৃত্যুর প্রেক্ষিতে এসইউসিআই(সি) রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ৩ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন, ম্যানহোলে নেমে ৩ জন ঠিকা শ্রমিকের মৃত্যু আসলে সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক খুনেরই নামান্তর। ম্যানহোলে শ্রমিক নামানো সম্পর্কিত সুপ্রিম কোর্টের সুরক্ষা বিষয়ক সতর্কতামূলক নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও সরকার নিযুক্ত ঠিকাদার সংস্থার দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজের জন্য হতদরিদ্র ঠিকা শ্রমিকের মৃত্যুর সম্পূর্ণ দায় সরকারেরই। প্রথম জন উঠে না এলেও তারপর আরও ২ জনকে নামিয়ে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়ার মতো অমানবিক কাজ আর হয় না। তিন বছর আগে কুঁদঘাটে ৪ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে এবং এমন ঘটনা এই শহরে বারবার ঘটছে।

আমরা সরকারের সংশ্লিষ্ট দফতরের যাঁরা এই কাজ দেখভাল করেন তাঁরা সহ ঠিকাদারদের কঠোর শাস্তির দাবি করছি। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মোতাবেক মৃত শ্রমিকদের পরিবারগুলিকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ এবং পরিবারের একজনকে সরকারি চাকরি দেওয়ার দাবি করছি আমরা। আমাদের আরও দাবি, কোনও ভাবেই যাতে এই ধরনের মর্মান্তিক মৃত্যু না ঘটতে পারে, তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে এবং সেগুলি যাতে কার্যকর হয় তার দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হবে।

বইমেলায় মার্ক্সবাদী সাহিত্যের আগ্রহ মেটাচ্ছে ‘গণদাবী’ স্টল

কলকাতা বইমেলায় এসইউসিআই (সি)-র মুখপত্র গণদাবীর নামাঙ্কিত ৫৬২ নম্বর স্টল থেকে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষ চিন্তাধারা সম্বলিত বই ও পত্রপত্রিকা সংগ্রহে সাধারণ মানুষের আগ্রহ চোখে পড়ার মতো। প্রতিদিনই ভিড় করে আসছেন ছাত্র-যুব, বিশেষত বামপন্থী মানুষেরা। কমরেড শিবদাস ঘোষের বই ছাড়াও কমরেড প্রভাস ঘোষের বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে আলোচনাগুলি নিয়েও যথেষ্ট আকর্ষণ দেখা গেছে। মনীষীদের জীবনসংগ্রাম সম্পর্কিত বিভিন্ন বইও মানুষ আগ্রহের সঙ্গে সংগ্রহ করছেন।

উত্তরপ্রদেশ এখন অপরাধীদের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র

৩০ জানুয়ারি থেকে নিখোঁজ থাকা এক তরুণীর পরিবারের আর্জিতে সামান্য কর্ণপাতও করেনি উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যার কোতোয়ালি থানার পুলিশ। পুলিশের এই ভূমিকার ফলে পরের দিন তাঁর ক্ষতবিক্ষত, নগ্ন মৃতদেহ উদ্ধার হল এক নালা থেকে।

অযোধ্যা নিয়ে বিজেপি-আরএসএস বাহিনীর প্রচারের শেষ নেই। সেই অযোধ্যায় ভাগবত পাঠ শুনতে যাওয়া তরুণীকে তুলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করে বীভৎস ভাবে খুন করল দুষ্কৃতী বাহিনী। এর আগেও অযোধ্যায় একাধিক ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ কিন্তু নির্বিকার। সরকার এবং প্রশাসনের এই ভূমিকার তীব্র নিন্দা করে ৩ ফেব্রুয়ারি এস ইউ সি আই (সি)-র পূর্ব উত্তরপ্রদেশ রাজ্য সম্পাদক রবিশঙ্কর মৌর্য এক বিবৃতিতে জানান, পুলিশ মূক-বধির সেজে থেকে অপরাধীদের দুষ্কর্মের সুযোগ করে দিয়েছে। সরকার এখন কিছু ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করে দায়িত্ব শেষ করে দিতে চাইছে। উত্তরপ্রদেশ অপরাধীদের অবাধ বিচরণের ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। তিনি বলেন, মহাকুম্ভ মেলায় পদপিষ্ট হয়ে বহু মানুষের মৃত্যুর ঘটনাতেও উত্তরপ্রদেশ সরকারের প্রশাসনিক দক্ষতা নিয়ে মিথ্যাপ্রচারের পর্দা ফাঁস হয়ে গেছে।

কমরেড রবিশঙ্কর মৌর্য বলেন, উত্তরপ্রদেশে ছাত্রী থেকে শুরু করে সমস্ত মহিলার নিরাপত্তা বলে কিছু নেই। সমাজে ভয়ের বাতাবরণ বিরাজ করছে। দলের পক্ষ থেকে অপরাধীদের কঠোর শাস্তি এবং গাফিলতির জন্য দায়ী পুলিশকর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে।

স্মার্ট মিটার বাতিলের দাবি

একের পাতার পর

কোষাধ্যক্ষ অজয় চাট্যার্জী, অল আসাম ইলেক্ট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অজয় আচার্য এবং অ্যাবেকার প্রাক্তন সম্পাদক ও অন্যতম সহসভাপতি অমল মাইতি প্রমুখ। বার্তা পাঠান বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ সেন।

২ ফেব্রুয়ারি বারুইপুর রবীন্দ্রভবনে অনুষ্ঠিত হয় প্রতিনিধি সম্মেলন। পাঁচশো জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে অল ইন্ডিয়া ইলেক্ট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের কার্যকরী সভাপতি সমর সিনহা বন্টন কোম্পানির কর্মচারীদের সাথে গ্রাহকদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। সম্মেলন থেকে অনুকূল ভদ্রকে সভাপতি, সুব্রত বিশ্বাসকে সাধারণ সম্পাদক হিসাবে পুনরায় নির্বাচিত করা হয়।

বক্তব্য রাখছেন অ্যাবেকার রাজ্য সম্পাদক সুব্রত বিশ্বাস

উৎপাদন খরচের থেকেও কম পাটের এমএসপি
তীব্র প্রতিবাদ পাটচাষি সংগ্রাম কমিটির

আগামী বছরের জন্য পাটের দাম কুইন্টাল প্রতি ৩১৫ টাকা বাড়িয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ৫৬৫০ টাকা ঘোষণা করেছে। এই দাম পাটচাষিদের সাথে সরকারের বিরাট প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়! পাটের কুইন্টাল প্রতি উৎপাদন খরচ কমপক্ষে ৯ হাজার টাকা।

বছরের পর বছর লোকসানে চলা পাটচাষিদের দুর্দশার কথা, ১৮ জুলাই ২০২৪ এবং ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ পাটের দাম নির্ধারণের প্রাইস কমিশনের মিটিং-এ সারা বাংলা পাটচাষি সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে স্মারকলিপি দিয়ে জানানো হয়েছিল। কমিটি সুস্পষ্টভাবে প্রাইস কমিশনকে বলেছিল, পাটের উৎপাদন খরচ কমপক্ষে ৯ হাজার টাকা কুইন্টাল ধরা হোক। সরকার কৃষকদের দাবি মানল না। সরকার নির্ধারিত এমএসপি উৎপাদন খরচের ৬৫ শতাংশও দিচ্ছে না। ডঃ স্বামীনাথন কমিটির সুপারিশ হল, এমএসপি হওয়া উচিত প্রকৃত উৎপাদন খরচের দেড়গুণ। সেই অনুযায়ী সরকার নির্ধারিত সহায়ক মূল্য কোনওমতেই ১৩ হাজার টাকা কুইন্টালের কম হতে পারে না। সরকারের পাটনীতির ফলে রাজ্যের ৪০ লক্ষ পাটচাষি বিপন্ন। লক্ষ লক্ষ চটকল শ্রমিক ও পাটশিল্পকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে সরকারের নীতি।

Editor : Amitava Chatterjee ■ Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed by Soumen Basu at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com